২৭ এপ্রিল ১৯৯৪ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

আনন্দমেলা

■ বায়ুদূষণ রোধে জাপানে নতুন ব্যবস্থা
■ বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

■ বিশ্বকাপ জিততে পারে ব্রাজিল
■ কেমন খেলবে আটটি দেশ

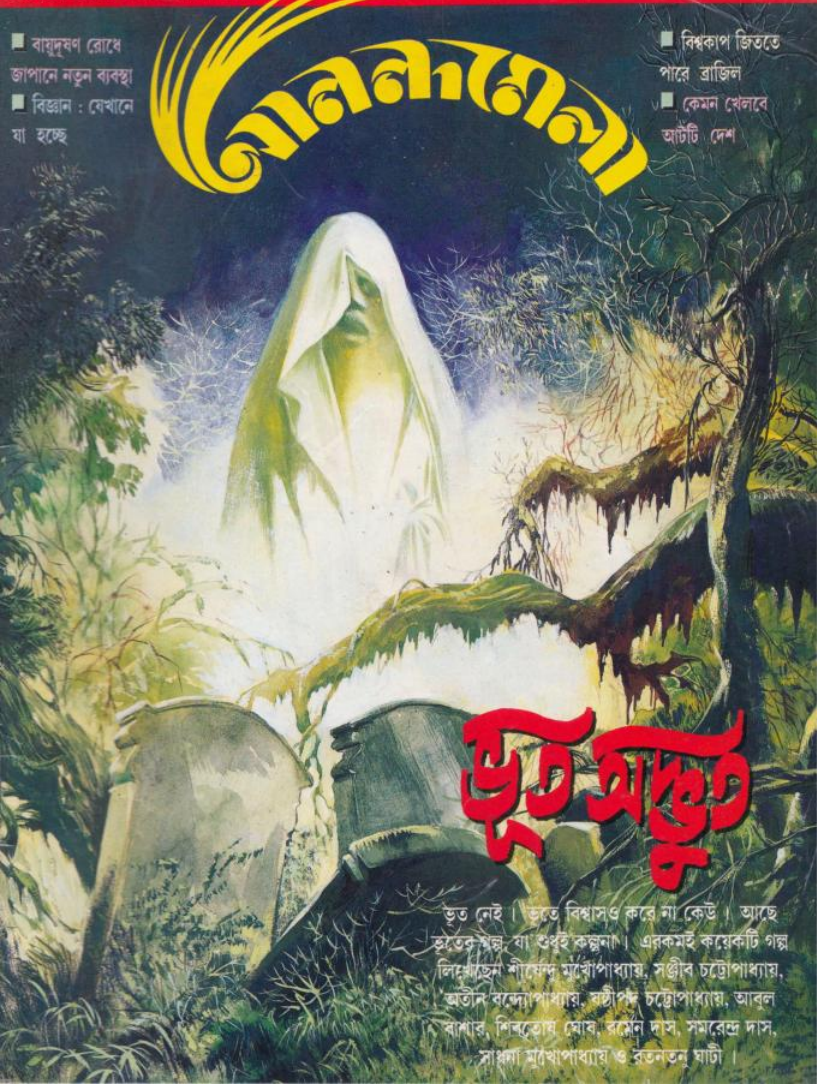

ভূত অদ্ভুত

ভূত নেই। ভূতে বিশ্বাসও করে না কেউ। আছে ভূতের গল্প, যা শুধুই কল্পনা। এরকমই কয়েকটি গল্প লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাশার, শিবতোষ ঘোষ, রমেন দাস, সমরেন্দ্র দাস, সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় ও রতনতনু ঘাটী।

মিলটন

প্রেস্টো

হিম শীতল জল। না টপ টপ, না ছপ ছপ।

না টপ টপ।

না ছপ ছপ।

না চলকায়।

না ছিটকে যায়।

না ছড়ায়।

না গড়ায়।

না প্যাচপ্যাচে।

না স্যাঁতস্যাঁতে।

না ফোঁটা ঝরে।

না চুঁয়ে পড়ে।

না বয়ে যায়।

না ঝরে যায়।

টিপলে চটপট, জল বেরোয় ঝটফট।

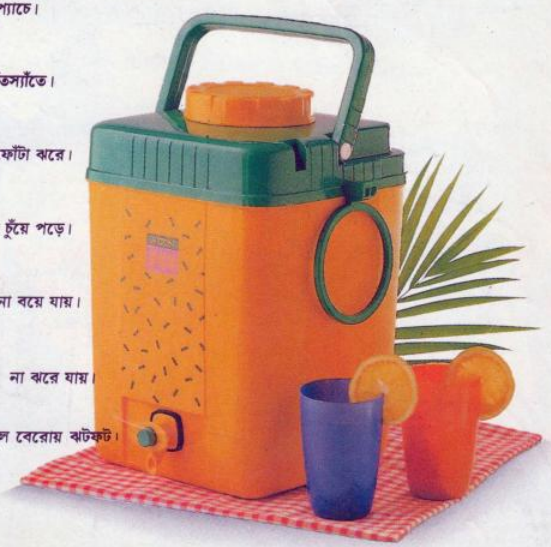

৫, ৮, ১১ আর ১৫ লিটারে পাওয়া যায়।

Ambience/MP/218/Ben

১৩ বৈশাখ ১৪০১ ❑ ২৭ এপ্রিল ১৯৯৪ ❑ ২০ বর্ষ ১ সংখ্যা

আনন্দমেলা

ভূতের গল্প
কালাচাঁদের দোকান শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪
ভূতের চিরুনি আবুল বাশার ৭
নিশির ডাক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৮
মানুষই ভূত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
শিমুলতলার মাধবী লজ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২৫
ভূত দেখা কলা বেচা শিবতোষ ঘোষ ৩৩
মীন দ্বীপের ভূত রতনতনু ঘাটী ৩৭
সেই ছেলেটা রমেন দাস ৪৬
পপি সাধনা মুখোপাধ্যায় ৪৯
বটুকদের আমবাগান সমরেন্দ্র দাস ৫৫
কবিতা
গল্প থেকে ভূত উড়ে যায় শ্যামলকান্তি দাশ ২২
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
রহস্য যখন গভীর দেবল দেববর্মা ৫৮
ধারাবাহিক উপন্যাস
মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না বিমল কর ১৫
শিউলি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭৫
কমিক্স
অরণ্যদেব ৩১, টিনটিন ৫৩, গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স ৬৯, আর্চি ৭১, গাবলু ৭৩, টারজান ৭৪
বাইরের জানালা
বায়ুদূষণ রোধে জাপানে নতুন ব্যবস্থা সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
খেলাধুলো
বিশ্বকাপ ফুটবলে কেমন খেলবে আটটি দেশ
শৌনক ঘোষ ৪১
বিশ্বকাপ জিততে পারে ব্রাজিল তানাজি সেনগুপ্ত ৪৪
নিয়মিত বিভাগ
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১, শব্দসন্ধান ৭৬, আঁকিবুকি ৭৮, হাসিখুশি ৭৮, নানারকম ৭৯, কুইজ ৮০
প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ভূত নেই, আছে ভূতের কল্পনা। এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই দেশ-বিদেশের লেখকরা লিখেছেন আশ্চর্য সব ভূতের গল্প। উন্নত মানের সাহিত্যকর্মের জন্য এই ধরনের অনেক গল্পই পাঠকদের মন জয় করেছে। ভূতে কেউ বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন না কোনও কুসংস্কারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের চিন্তাধারায় এনেছে বিপ্লব। লেখক ও শিল্পীরা তা জানেন। তবু কল্পকাহিনী হিসেবে ভূতের গল্প এখনও লেখা হয়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিখ্যাত অনেক লেখকই লিখেছেন ভূতের গল্প। সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এও ভূতের রাজাকে বর দিতে দেখা যায়। ভূতের গল্পের ধারাটি এভাবে চলে আসছে। এই সংখ্যায় দেওয়া হল ভূতের কিছু নতুন গল্প।

■ আগামী সংখ্যায় ■

প্রচ্ছদকাহিনী

সত্যি গোয়েন্দা

ওঁরা গল্পের গোয়েন্দা নন। শার্লক হোম্‌স, ব্যোমকেশ কিংবা ফেলুদার মতো নন বিখ্যাত। কিন্তু বাস্তবে ওঁরাই করেন জটিল সব রহস্যের সমাধান। রীতিমত চাঞ্চল্যকর তাঁদের কাণ্ডকারখানা। অপরাধীদের ধরতে ওঁদের জুড়ি নেই। প্রচ্ছদকাহিনীতে আছে সত্যি গোয়েন্দাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নানা বিবরণ।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প

শিবকালীর যাত্রা দেখা

কুইজ, কমিক্স ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

ভূতের গল্প

কালাচাঁদের দোকান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ-স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, "আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!"

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?"

গিন্নি বললেন, "ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এর পর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।"

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, "একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।"

বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা-ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, "কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?"

নবীনবাবু বললেন, "বাজার এখান থেকে

এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু'দিন হাট।"

"তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?"

"ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে!"

"জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।"

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কী আর করা! নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।"

প্রথমদিন বাজার করতে দু' ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারিদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালও নয়। পাওয়াও যায় না সব কিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, "আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ-জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!"

নবীনবাবু ফাঁপড়ে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, "ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?"

"তেল পাব কোথায়?"

"দ্যাখো না একটু খুঁজে-পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।"

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপানা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, "আজ্ঞে আসুন।"

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, "আছে। ভাল ঘানির তেল।"

"কত দাম?"

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, "দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ' টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু' ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, "বাঃ, এ তো

দারুণ ভাল তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো ?"

নবীনবাবু বললেন, "আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভাল।"

লোকটা যে সত্যিই ভাল তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু'দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, "আপনাকে অত দাম দিতে হবে না।"

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নামই তো জানি না এখনও।"

"আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।"

"আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু ?"

"যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও-সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।"

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, "ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু ?"

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমনো করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পাবেন না ? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।"

"দাম ?"

"দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো ! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে ? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায়-কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, 'সাত জন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।'"

"হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলব'খন।"

দু'দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, "তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের

পুরনো ?"

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, "তা কম হবে না। ধরুন, এ-গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।"

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরনোই হবে তা হলে দাস-গিন্নি এ-দোকানের কথা শোনেনি কেন ?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, "এ-গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, "হ্যাঁ গা, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো ! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, 'নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।'"

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, "কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।"

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ-কথা সে-কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, "তা কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।"

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী ? নিজেই আসবেন।"

"ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ-দোকানের কথা জানে না।"

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু-মৃদু হেসে বলে, "জানার দরকারই বা কী ? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, "হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও খদ্দের কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে ?"

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, "একজনের জন্যই তো দোকান।"

"অ্যাঁ !"

কালাচাঁদ হাসল, "আসবেন।"

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয় ?"

"পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।"

"তাড়া কিসের ?"

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, "না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু'দিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকা-পয়সার কথা থাক।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন ! পাঁচ টাকা পাওনা ! বলে কী লোকটা ? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক সবজিও ক্রমে-ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, "ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।"

"দিয়ো না। হ্যাঁ গো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো ! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে ?"

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, "না না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয় ?"

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

ছবি : বিমল দাস

ভূতের গল্প

ভূতের চিরুনি

আবুল বাশার

জ্বর হলে ভূত দেখতে পেতেন দিনুখুড়ো। আবিরমামা গতিলালকে বলেছিলেন, জ্বর গায়ে দিনু দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে গান গাইতেন। সবাই বলত, খুড়ো অমন করেই ভূত নামায়।

নীলকুঠির পুরনো দরোয়ান ছিলেন দিনু সিকদার। সাদা চামড়ার সাহেবদের নীলের ব্যবসা কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারাও স্বাধীনতার কত আগে কুঠি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির দরোয়ানি বজায় ছিল স্বাধীনতার পরেও। শেঠের দিঘির চৌধুরীরা কুঠি-এলাকার মালিকানা পেয়েছিলেন সাহেবদের কাছ থেকে। তাঁরাই দিনুখুড়োকে কুঠির দরোয়ানির চাকরিতে বহাল রেখেছিলেন সাহেবদের মতোই। খুড়োর ছিল সাড়ে সাত টাকা মাইনে। দিন বদলেছে, কিন্তু মাস-মাইনে তাঁর বাড়েনি।

কিছুকাল আগের কথা ! কুঠির প্রকাণ্ড লোহার গেটের মুখে খুড়ো একটি পানবিড়ির দোকান খুলেছিলেন। দোকান চালাত ভাইপো সিধুচরণ। সন্ধ্যার মুখে ওই দোকান খুলত ভাইপোটা, দিনমান মাঠে খাটত।

শোনা যায়, দিনুখুড়ো সোয়াশো বছর বেঁচে ছিলেন। দিনের বেলা কুঠির গেট খোলা, কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে-না-যেতেই সেই গেট বন্ধ করে দিতেন সিকদার। লোক ঢুকতে পারত না। ভাইপোর পানবিড়ির দোকানে সারারাত টিমটিম করে কুপির আলো জ্বলত। গোরুর ব্যাপারিরা রাতে পাকা সড়ক দিয়ে গোরুর দল হাঁকিয়ে নিয়ে যেত সীমান্তের দিকে। বাংলাদেশে ওই গোরু চালান যেত। তখনকার কালে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। সেই ব্যাপারিরা ওই দোকান থেকে পানবিড়ি কিনত।

মামা বলেছিলেন, কুঠি জায়গাটাই ছিল ভূতগ্রস্ত। ভূত এবং জিন কুঠিকে ঘিরে থাকত। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে-সঙ্গে গেটের কাছে ফিটনের ঝুমঝুম শব্দ ভেসে উঠত। ব্যাপারিদের মুখে শুনেছিলেন আবিরমামা। অশ্বের তীব্র হ্রেষাও নাকি শোনা যেত। মাঝে-মাঝে দরোয়ানের তকমা আঁটা দিনুর অস্বাভাবিক দুর্বোধ কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হত। বাতাসে ভাসত বর্মা চুরুটের গন্ধ। ফরাসি আতরের উগ্র ঝাঁঝ, গোলাপজলের ঠাণ্ডা হাওয়া গেটের সড়কে গোত্তা খেয়ে খেলে উঠত। মদির একটা গন্ধও মিশে থাকত সেই বাতাসে। বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত, নারী-পুরুষের চাপা গলার আলাপ। ভাঙা বাংলা আর চড়া হিন্দির মেশানো অদ্ভুত সাহেবি ভাষা ব্যাপারিরা শুনেছে।

জ্বরের গায়ে দিনুখুড়ো সাহেব-মেমদের স্যালুট করছেন, ফিটন এসে ভিড়েছে গেটের মুখে, সে ভারী চমৎকার দৃশ্য। আপনা থেকে কড় কড় করে লোহার গেট খুলে যাচ্ছে, কুঠির ভেতর দালানের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে।

জ্বলন্ত বরফের মতো সাদা ঘোড়াগুলি ঝড়ের বেগে গাড়ি টেনে এসে পাথরের বড় গামলায় মুখ ডুবিয়ে জাবনা আর জল খাচ্ছে। এক মেম ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে ধরা, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

গায়ে জ্বর না এলে খুড়ো এইসব দৃশ্য দেখতে পান না। তিনি বলেছিলেন, "বুঝলে আবিরলাল, কুঠির বাগানে বাঁশবনের ওইদিকে একটা বুড়ো গো-জিন চরে বেড়ায়। গো-জিন কি না বুঝবে কী করে ? তা হলে তোমাকে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে এখানে আসতে হবে। গো-ভূত হোক আর গো-জিন হোক, ওরা হাড় খায়।"

আবিরমামা এ-কথা শোনামাত্র আঁতকে উঠলেন ভয়ে। "হাড় খায় ?"

খুড়ো তাজ্জব গলায় হেসে ফেলে বললেন, "হ্যাঁ বাপু। হাড়। মানুষের হাড়। কঙ্কাল খায়।"

"কিন্তু এখানে কঙ্কাল কোথায় খুড়ো ?"

"আছে বইকী আবিরলাল ! কুঠি আছে আর মানুষের হাড় থাকবে না ! কাউকে যদি না বলে ফ্যালো, তোমাকে দেখাতে পারি। খুব সাবধান ! কথা যেন দু'কান না হয় আবির ! আগে দ্যাখো, তারপর চেপে যাও। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় এসো।"

আবিরমামার কাছে আমরা নানাথানা ভূতের গল্প শুনে আসছি বরাবর। গত্তি আমার জ্যাঠতুতো দাদা, আমার নাম কিরণ। আমার দু'-চারটি ডাকনাম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধ হয় চুনো।

মামা একদিন আমাকে শুনিয়ে বলেছিল, "শোন চুনো, কুঠি হলেই জানবি, জায়গাটার নিশ্চয়ই বদনাম আছে। এককালে নীলকর সাহেবরা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ করাত, ধান বুনতে দিত না। না খেয়ে মরতে হত চাষিকে। কোনও চাষি অবাধ্য হলে তার হালের বলদ, জোত-জোয়াল সব ছিনিয়ে নিত নীলের সাহেব, পেয়াদা দিয়ে

ধরে এনে এই কুঠিতে ভয়ানক মারধর করত। মারতে-মারতে মেরে ফেলত পর্যন্ত। তারপর সেই মৃতদেহকে কোথায় যে ফেলে দিত !"

গন্ডিদাদা বলল, "নীলের ব্যবসায় সাহেবদের খুব লাভ হত, তাই না মামা ?"

মামা বললেন, "সাহেবরা ওই নীল চালান দিত বাইরে। মোটা টাকা লাভ করত। এদিকে চাষি সংবৎসরের জন্য মুখের খাবার জোগাড় করতে পারত না। ধানের জমিতে নীল ফলাতে হলে ভাতের জোগাড় হয় কী করে ! দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে সাহেবদের সেই অত্যাচারের ঘটনা পাওয়া যায়। কী নিষ্ঠুর আর মর্মান্তিক !"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ওই কুঠিতে কখনও ঢুকেছিলে তুমি ?"

মামার মুখের রং কেমন একটুখানি বদলে গেল, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় মামা বললেন, "হ্যাঁ চুনো, মাত্র একবার। সেই ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাতে। যাকে বলে ফিনফোটা জ্যোৎস্না চারদিক টইটই করছে। আর বাজিতপুরের দিগন্তজোড়া মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছে মন-কেমন-করা আশ্চর্য জোরদার হাওয়া। দিনুখুড়ো মাঠের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মাঠে ভুলো নেমেছে।"

মাঠের ভেতর সত্যিই জ্যোৎস্নার ম-ম করা ধাঁধাশের সমুদ্রে দপ করে আলো জ্বলে উঠছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, বিলের পাড়ে কয়েকটি আলো ছোটাছুটি করছে, শুনেছি স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটিতে এক ধরনের গ্যাস তোয়ের হয়, তাইতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভুলোটুলো বাজে কথা। দু'দিন আগে ভাল জলঝড় হয়েছে, সে কারণে ভুলোর আমদানি হয়েছে।

এইসব যুক্তি পেশ করার পর আবিরমামা বললেন, "সবই বুঝতাম চুনো। কিন্তু দিনুখুড়োর গলার মধ্যে কী ছিল কে জানে, ভুলোর আলো দেখে গা কেমন ছমছম করে উঠল। খুড়ো বললেন, 'এই ধরনের রাতে গো-জিনদের মজ্জব হয় আবির ! এসো তোমাকে কঙ্কাল সরোবরে নিয়ে যাই।'"

কঙ্কাল সরোবর কথাটাই কেমন ভয় ধরানোর মতো। হঠাৎ কুঠির দালানের পুরনো কাঠামো হাওয়ার আঘাতে মটমট করে উঠল বুঝি। লোহার গেট কড়কড় শব্দে খুলে যেতে লাগল।

"'আপনিই খোলে নাকি খুড়ো ?'

"'তা খোলে বইকী ! ঘোড়াগাড়ি ঢুকবে কি না ! চোখে দেখবে না ঠিক, তবে কানে শুনবে। আগে এই শরবতটুকু খেয়ে নাও।'

"'কেন ?'

"'বলছি খাও, প্রশ্ন কোরো না।' বলে দিনুখুড়ো মস্ত গোল কাঠের টিপয়ে রাখা ঢাকনা-ঢাকা গেলাসের শরবত হাতে করে তুলে ঢাকনা সরিয়ে আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন। বললেন, 'তুমি খাবে, আমি মন্ত্র পড়ব। ভয়পেয়ো না, এই রাতে যেসব ভূত আসে তারা কতক মিস্ত্রি, কতক হলগে বাড়ি তৈরি করা এঞ্জিনিয়ার। এরা কেউ ফোরাত নদীর ধারে নগর গড়েছিল, কেউ পারস্যের মহল গড়েছিল। প্যালেস্টাইনে এরাই বানিয়েছিল এঁরাবত দুর্গের ধাঁচা। বাদশা সুলেমানের আমলে এদের বংশধররাই ময়ূর মহল নির্মাণ করেছিল। মনে রাখবে খাটিয়ে লোকরা চিরকাল বোকা হয়। সেইজন্যে ভূত বলতে জনগণকেও বোঝায়।'

"'আপনি খুড়ো খুব শিক্ষিত লোকের মতো কথা বলছেন !'

"'তা বলছি, কেননা সমস্ত কথা আমার মুখস্থ আছে। হাজারদুয়ারির গাইডরা যেরকম শিক্ষিত ভাষায় কথা বলে, আমিও সেইরকম বলি। কুঠির গাইড আমি। তা ছাড়া কালির অক্ষর আমার পেটেও কিছু আছে। শেঠের দিঘির চৌধুরীরা আমাকে যে বহাল রেখেছেন, তার প্রধান কারণ এই পালিশ করা ভাষা। আমি তাঁদের বাড়ির বউদের পর্যন্ত গো-ভূত দেখিয়েছি। মাইনে সাড়ে সাত টাকা। কিন্তু বছরান্তে চৌধুরীরা আমাকে ধানগম সাহায্য করেন, কুঠির সবজির একটা ভাগ পাই।'

"এক মিনিট চুপ করে থেকে খুড়ো বললেন, 'এখানে কোনও চাষি চাষবাস করতে আসবে না। গো-জিন যেখানে থাকে, গোরু ডরায় বাবা ! শুধু ট্রাকটার দিয়ে চাষ করানো যায় বটে, কিন্তু চৌধুরীর ড্রাইভার সাহস করেনি। অগত্যা এই দিনুই ভাগজোত টেনে এই কুঠি আগলাচ্ছে। ভাইপোটাকে বলি, ও রে সিধে, এখানের মন্ত্রপাঠ শিখে হাল ধর বাবা, তা সে ভয়েই আসে না।'

"'দম ফেলে খুড়ো মন্ত্র আওড়ে উঠলেন, 'ই আর কি, মুই আর কি ফট ! সামনে ভূতের পট। তুমি দেখবা আবিরলাল ?'

"'আজ্ঞে !' ভয়ে মামার গলা শুখু-শুখু।

"'ঢোক গিলে মামা শুধালেন, 'কী দেখব খুড়ো ?'

"'আগে গলা ভিজিয়ে নাও, তারপর সব হচ্ছে ! ভূতের পট নিশ্চয় তোমাকে দেখাব। ওরা পট টাঙিয়ে দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ইমারত বানাত ! নগর তৈরি করত। ইকড়ি মিকড়ি চিক। তিনি আছেন পচ্ছিম দিক।'

"'তিনি কে ?'

"'আর কে ! যে ভূতটা পট লেখে !'

"'কোথা ?'

"'আর কোথা ! ওই হোথা। চল দেখাচ্ছি। আগে শরবত শেষ কর।'"

ভয়ে মামা ঢকঢক করে গেলাসের শরবত খেয়ে ফেললেন। যদিও আবিরমামা ভূত ঠিক বিশ্বাস করেন না, তাঁর ধারণা মনের কোনও ধরনের বিকার হলে ওই পদার্থ দেখা গেলেও যেতে পারে, সুস্থ মানুষ ভূত দেখে না। তবু তাঁর ভয়ই করছিল। কুঠির দালানগুলো এমনিতেই পোড়ো, পলস্তরা খসা, লাল ছোট-ছোট ইটের দাঁত বের করা, থামগুলো নোনায় খাওয়া, একেবারেই দড় মনে হয় না। সিলিং অনেক উঁচু, পুরনো শালকাঠের তীরবরগা অনেক স্থানে ক্ষয়ে হড়কে খসে যেতে বসেছে, কিছু স্থলে ছাদ পড়ে গিয়েছে। বুনো পায়রা, প্যাঁচা, বাদুড় নানা জায়গায় বাসা গেড়েছে, মাঝে-মাঝেই বিদঘুটে চিৎকার করে উঠছে। এখানে দাঁড়াশ সাপ ঘুরে বেড়ায়।

শরবত খাওয়া শেষ হলে খালি গেলাস টিপয়ে রেখে দিয়ে খুড়ো বললেন, "এটা খেলে তো ! এবার তোমার গায়ে সামান্য তাপ বাড়বে। মাথাটা ঝিকোবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, কালী কটকা, হাওয়াই সটকা, মন্তর। হিবু ডিবু গুরুং খাঞ্জি পটিতং ঘ্রাউ, মিস্ত্রির গন্ধ পাও ?"

"আজ্ঞে কিছুকিঞ্চিৎ পাই।"

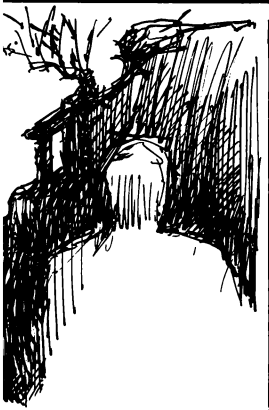

"পট পটিতং পড়চা, পাচকিসিতন খরচা, রং আর তুলি। এসো।"

"আজ্ঞে কোথা ?"

"পটের সামনে।"

আবিরমামাকে হাত ধরে একটি ভাঙা গুহার মতো জায়গায় টেনে আনলেন দিনু সিকদার। গুহার মুখে, আসলে ঘরের দেওয়াল খসে গিয়ে গুহাবৎ দেখায়, তার মুখে কালো পরদা ঝুলছে, তারই গায়ে আঁকা সাদা রঙের নরকঙ্কালের ভয়ঙ্কর ছবি, দেখেই রক্ত বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

"এর নাম দুম্বা পীর। ভূতের এরকম লেজ দেখেছ কখনও ? উল্কা আকাশে ছিটিয়ে গেলে যেরকম ঝরা আগুনের স্রোত হয়, ঝাঁটার মতো, দুম্বার সেইরকম লেজ ছিল। ওইটে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উনি জিন তাড়াতেন, ভূতের চালচলন সিধে করতেন। মিশরের লাল দরিয়ার তীরে তাঁর ছিল বাবার নৌকো গড়ার ব্যবসা। ব্যবসায় তাঁর মন ছিল না।"

"তো, কীসব বলছেন আপনি খুড়ো ? এখানে সেই পীর থাকতেন ?"

"হ্যাঁ। এ ছিল সাহেবের হাওয়াখানা। ওই পীরকে উনি আশ্রয় দেন। এখন আমিই এখানে পীরের খিদমত করি, মানে সেবা করি। এই পটের নকশা তাঁরই শিক্ষা। তাঁর হাতে ছিল একটা লাঠি। জাদুলাঠি বলা যায়। এই গোটা চাকলা ছিল আমার ঠাকুরদার বাবার তিনপুরুষ আগের জমিজিরাত। সাহেবরা কেড়ে নিয়ে কুঠি বসায়। ঠাকুরদার পূর্ব পুরুষরা এখনও আছেন। কঙ্কাল সরোবরের ধারে একটা মহল আছে, সেখানে।"

"কীভাবে আছেন তাঁরা ?"

"কঙ্কাল হয়ে ঝুলছেন।"

"পীরের লাঠিটা ?"

"তাও আছে। সুলেমানি আষা। ময়ূর মহল যখন তৈরি হচ্ছে, বাদশা একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে লাঠিটা পিছনে প্যালা দিয়ে মানে ঠেকনো করে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। রাতদিন যতক্ষণ কাজ চলত, উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুম্বা পীরের পূর্বপুরুষরা মিস্ত্রি ছিল। তারা কাজ করতে করতে মুখ তুলে বাদশাকে যে একবার চেয়ে দেখবে, তাতেও ভয়। এতই কড়া বাদশা ছিলেন সুলেমান।"

"তারপর ?"

"একদিন বাদশা কাজের তদারকি করতে করতে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মারা গেলেন, কেউ জানতেও পারল না। তখন বাদশার পোষা জিনেরা বাদশাকে ওইভাবেই খাড়া করে রেখে দিল। লোকেরা বাদশা রয়েছেন দেখে হাত চালিয়ে রাতদিন কাজ করে মহল বানিয়ে ফেলল। দুম্বার বাবা হেড মিস্ত্রি। কাজ শেষে বাদশার সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দিলে। মিস্ত্রির হাতের সামান্য ধাক্কা লেগে গেল বাদশার পায়ে। বাদশা উলটে পড়ে গেলেন। তখন দুম্বার বাবা বুঝলেন, তারাও কেউ বেঁচে নেই, তারা সব ভূত হয়ে গেছে।"

আবিরমামা বললেন, "আমার নেশা হয়েছে খুড়ো। জ্বর-জ্বর লাগছে। ফিটনের শব্দ পাচ্ছি। বাদশার লাঠিটা তা হলে দুম্বার বাপ..."

"হ্যাঁ গো ! ওই লাঠি হাতে করে দুম্বা তখন মরুভূমির বুকে বিবাগী হয়ে পীরত্বের জন্য বের হয়ে চলে আসেন। জিনসিদ্ধ লাঠি। নীল সাহেব ভেবেছিল তারাও ওইভাবে চাষিদের ওপর তদারকি করবে। মরে গিয়েও পাহারা দেবে। সেইজন্য কঙ্কাল লটকে রেখে গেছে।"

ধীরে-ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েন মামা আবিরলাল। কঙ্কাল সরোবরের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন মামা আর দিনুখুড়ো। এক আশ্চর্য দুর্বোধ ভাষায় গান গাইতে লাগলেন দিনু সিকদার। সরোবরে অনেকরকমের ফুল ফুটেছে। নানা তার রং। সাদা ফুলগুলো হিরের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ জল তোলপাড় করে ভেসে উঠল কয়েকটি কঙ্কাল। তারপর তারা জলের ওপর অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। এরা কি সব মিস্ত্রি ?

"নাচে কারা খুড়ো ?"

"কই, কারা নাচে বাবা ?"

"আমি যে দেখছি।"

"নেশা হয়েছে আবির। খুয়াব-এ-দুম্বা পাচক খেয়েছ, হাতেনাতে ফল পাচ্ছ। ভূত তো কেউ বিশ্বাস করে না, প্যাঁচ পড়লে করে। আর কী দ্যাখো হে ?"

কত কী যে দেখতে পাচ্ছিলেন মামা। ভূতের পট বারবার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। একটা রাজা-ভূতের নাম ভারত-ভূশন্ডী জননাথন, আর-একটা উপজাতি ধরনের ভূতের নাম কিমাশ্চর্য পারস্যের চাকমা, ছোট রাজ্যের নাম কিমাগড়। সেই কিমাগড়ির ভূতের জমিদার গরুড়ানন্দ পটপটেশ্বর, তাঁর বংশলতিকায় নিম্নস্থানে রয়েছে মির্জা আয়কবাযকম ক্ষতিবুদ্দিন গাড়োয়ান। সত্যি সেলুকাস ! কী বিচিত্র এই কুঠিয়ালি ভূতের দেশ।

একটা দেওদার গাছের দিকে মামার চোখ চলে যায় সহসা। সরোবরের নাচ থেমেছে, আশ্চর্য পূর্ণিমায় মৃতেরা কি এইভাবে জেগে ওঠে ? দেওদারের মাথার ওপর গোল চাঁদ ফটফট করে হেসেই আকুল। গাছের নীচে ঘাসের জমিতে অত্যন্ত ফরসা একটি মেয়ে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছে। অপূর্ব তার রূপ। ও কারও দিকে চাইছে না, আকাশ পারে চেয়ে আছে। ওর চোখ দিয়ে গলে পড়ছে নিঃশব্দ কান্নার জল। কেন কাঁদছে ওই সুন্দরী ? ওখানেই বা ওইভাবে বসে আছে কেন ? ও কি পরি ? ও কি মানুষ নয় ? ওর ডানা কোথায় ? ও কি কারও জন্য প্রতীক্ষা করছে ? তবে কি সে কোনও রাজকন্যা ?

খুড়ো আবিরমামার একটা হাত চেপে ধরে ছড়া কাটলেন :

দোল দোল দুলুনি
ভূতের মাথায় চিরুনি।

অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটির মাথার চুলে একখানা চিরুনি গোঁজা। মামা এইভাবে বলেছিলেন আমাদের। ওঁর মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর মেয়ে কি কখনও ভূত হয় ?

খুব সাহস করে দেওদার তলায় এগিয়ে গিয়ে মামা দেখলেন কোনও মেয়ে নয়, ছায়ামেশানো খানিকটা জ্যোৎস্না, আর কিছু নেই। মামা এবার যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেলেন। জ্যোৎস্না তা হলে নিজেই কখনও

কখনও সুন্দরী মেয়ে সেজে বসে থাকে ! পরি হয় । যদিও মাথায় গোঁজা থাকে ভূতের চিরুনি ।

দিনুখুড়ো অতঃপর মামাকে একটি অন্ধকার মহলে ঢুকিয়ে দিলেন । ঘরে ঢুকেই অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান মামা । হাড়ে হাড়ে ঘা লেগে কেমন শব্দ হচ্ছে । কারা যেন কথা বলতে চাইছে । অথচ শব্দ ফুটে বের হচ্ছে না, ঘনঘন শ্বাস পড়ছে । মামার হাতে লাগল হাড়ের মতো শক্ত ধাঁচা একটি । বুঝতে পারলেন, শূন্যে ভাসছে মানুষের কঙ্কাল কয়েকটি । কী দিয়ে ঢাঙানো আছে অন্ধকারে বোঝা যায় না । ওই ওপরে ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্নার আভা আসে, তাতে কঙ্কালগুলোকে আরও ভয়াবহ মনে হয় ।

ফিসফিস করে উঠল কারা ? কানের ওপর শ্বাস ফেলল কে ? হি হি করে হাসছে একজন । কোনও একটা অদৃশ্য ফোকর বা গবাক্ষ দিয়ে খুব হাওয়া আসছে মনে হয় । কে যেন বলল, "আমরা সব খেটে খাওয়া মানুষ বাবা ! আমার নাম তোরাপ । নাটকের লোক । দীনবন্ধুবাবুর নাটক । মনে নাই ? এখানে চাষিবউ খুব নাদান হয়, কাঁদে গো !"

আবিললাল কঙ্কাল ঠেলে–ঠেলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন । বাইরে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করছেন দিনুখুড়ো । কাকে যেন আয় আয় করে ডাকছেন । মনে পড়ে গেল গো-জিনের কঙ্কাল ভক্ষণ করতে আসার কথা ।

কঙ্কাল ঠেলতে-ঠেলতে ঘেমে উঠেছিলেন মামা । গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল তারা, কপালে লেগে ঝনঝন করে উঠছিল । হঠাৎ চড়া গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, "স্কাউন্ড্রেল ! পুত্তর কালটিভেটার । হামি টুমার কলিজা খাবে । হামার দণ্ড ডিয়া প্রহার করবে, কিল করবে ।"

অনেক কষ্টে কঙ্কাল মহল থেকে বের হয়ে আসেন মামা । বাঁশবাগানে ছায়া আর জ্যোৎস্নার মাখামাখি, কী একটা জীব ওখানে ঘুরছে । কালো তার রং । তাকেই বোধ হয় ডেকে চলেছেন দিনু সিকদার । মামা বাইরে এসে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন । ক্লান্তিতে আর ভয়ে হাঁফ নিতে-নিতে হঠাৎ মহলটার বাইরের একটা থামে পেতলের চাকতির ওপর চোখ পড়ে তাঁর । থামের গায়ে সাঁটা । উঠে গিয়ে মামা দেখলেন চাঁদের স্পষ্ট আলোয় লেখা রয়েছে, ইংরেজিতে, 'সায়েন্স ল্যাব' । তারপর সাহেবের নাম লেখা । এ তা হলে ল্যাবরেটরি, কঙ্কাল থাকবে না কেন !

এতক্ষণ তা হলে কী সব কথা শুনলেন আবিললাল ? তাঁর আশ্চর্য লাগছিল ই আর কি অর্থাৎ ইয়ার্কি, মুই আর কি—ফট, ফটকা, হাওয়াই সটকা দিনু সিকদারের কাণ্ড দেখে ! দিনু পট লেখে । ভূতের ছবি আঁকে । নানা কথায় বানিয়ে-বানিয়ে অবাক ভয়ঙ্কর কুঠিয়ালির প্রেতরাজ্য গড়েছেন ।

বাঁশবনে হাড় খাচ্ছে পশুটা । ভয়ই করছিল মামার । এখানে ভাগজোত করতে সত্যিই কোনও 'চাষি সাহস করে আসবে না । এ শুধুই দিনুখুড়োর ভাগজোতের জায়গা, তিনি ভূতের ভয় দেখিয়ে অন্য চাষিদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, একা ভোগ করছেন শেঠের চৌধুরীদের কুঠির সম্পত্তি । দিনুর অবস্থা কিন্তু সম্পন্ন ।

বাঁশবনের দিকে সাহস করে এগিয়ে চললেন মামা আবিললাল । ছায়া আর জ্যোৎস্নায় সে এক বিচিত্র সমাবেশ । মটমট করে শব্দ করছে বাঁশের গ্রন্থি, মনে হচ্ছে তারা বাতাসের মুখ-গহ্বরে হাড় চিবিয়ে চলেছে ।

বাঁশের ঠোঙা আর মরা পাতায় পা পড়ে পিছলে যেতে চায় । এক-একটা মানুষ থাকে, হাঁটাচলার সময়ও যাদের হাড় মটমট করে, দিনু সেইরকম মানুষ ।

মামার পেছনে মটমট করে ছুটে আসেন খুড়ো । তাঁর দেহের গ্রন্থি কি আলগা ? এই বয়েসেও খুব খাটিয়ে লোক, লাঙল চালাতে পারেন, মই চড়ে কোমর সিধে করে দাঁড়াতে চান জমির ওপর ।

খুড়ো বললেন, "মানুষের হাড়ের চিরুনি কখনও দেখেছ আবিললাল ? দেওদার গাছের ওখানে পড়ে ছিল । নাও, হাতে নিয়ে দ্যাখো ।"

কী আশ্চর্য ! সব বুঝেও মামা হাত বাড়াতে গিয়ে কেমন সাহস হারিয়ে ফেললেন । তখন দিনু পাহারাদার উঁচু স্বরে হো হো করে এবং হা হা করে হেসে ফেললেন । তাঁর দাতগুলো কি নকল ? এত বয়সে দাঁত থাকার কথা নয় । মনে হল, তিনি একটা ভূতের মতো হেসে চলেছেন ।

কালো জীবটা মাটি শুঁকে শুঁকে কী যেন খুঁজছে, আরে এ তো ভাগাড় । হাড় খুঁজছে নির্ঘাত । ওটা তা হলে কী ধরনের প্রাণী ?

খুড়ো বললেন, "লোম আছে । কাছে এলে মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে ওর গা আঁচড়ে দিই বাবা । পশুটা আনন্দ পায় ।"

আর সাহস হল না মামার । এখানে সব কেমন উলটোপালটা হয়ে গেছে । গো-জিনের গায়ের লোম আঁচড়ে দেওয়া হয় মানুষের হাড়ের চিরুনি দিয়ে, ভাবলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে ।

পশুটা নিশ্চয়ই খুব ভীরু । কাছে আসতে চাইছে না । মামা একটা দুর্বোধ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন । সেই শব্দে গো-জিন পালাতে পালাতে ভেউ করে কেঁদে উঠল । আকাশের দিকে মুখ তুলে কেঁদে উঠল । মামা ওকে তাড়া করে ছুটতে লাগলেন ।

মামা বসেছিলেন, দক্ষিণ কলকাতার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে । বন্ধুর পত্নী একজন বড় আমলা । তাঁর গাড়ির গ্যারাজের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে প্লেটে সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান' ।

কুঠির কুকুরটা ছিল পথের কুকুর । খিদের জ্বালায় ওই ভাগাড়ে পুরনো হাড় খুঁজে খেতে এসেছিল । তেড়ে ধরতে না পারলেও মামা ছুটতে-ছুটতে এক সময় বুঝতে পেরেছিলেন ওটা নিতান্তই ক্ষুধার্ত শীর্ণ কুকুর, রোগা, অসহায় । পথে পথে তার জীবন কেটে যায় ।

কলকাতার বন্ধু থাকেন প্রকাণ্ড উচ্চ সৌধে । এত বড় ফ্ল্যাট, আর চারদিক শোভাময়, দেওয়ালে লক্ষ টাকার চিত্র টাঙানো । একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র কুকুরকে সঙ্গে করে এসে দেখা দিলেন মিসেস ঝা । তাঁর বাংলা উচ্চারণে কেমন ইংরেজির মতো গন্ধমাখানো, শ্বাসাঘাতে ইংরেজির মতো জড়িমা । কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটি স্ফটিকশুভ্র পাথরের দামি প্লেটে ভর্তি করা সাদা শাঁক আলুর খাবার এগিয়ে দিলেন । তাঁর স্বামী বর ব্যবসায়ী । কলকাতার বুকে তিনি বস্তি উঠিয়ে দিয়ে ইমারত তৈরির ব্যবসা করেন । প্রমোটার ।

মামার বন্ধু হওয়ার কথা নয় । বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন । সামান্য একটা কথা জেনে নেওয়ার জন্য এসেছেন মামা । কিন্তু লোকটা যে এত ধনী তা তিনি জানতেন না । স্ত্রী বাঁ হাতে চিরুনি ধরে মাথার চুল আঁচড়ে নিতে নিতে অকারণ হেসে মামাকে দৃষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন । নিজের চুল আঁচড়ে নিয়ে কুকুরকে খাওয়াতে-খাওয়াতে হঠাৎ সেই চিরুনি কুকুরের বলিষ্ঠ গায়ে লোমের ভিতর চালাতে-চালাতে কথা বললেন, "আপনার নাম ?"

কুকুরটার দেহ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল । চোখ তুলে মামার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করল কুকুরটা । প্রাণীটার লেজ আগুনের ঝাঁটার মতো লেলিহান । মামা আশ্চর্য ভয় পেয়ে লক্ষ করলেন, এ নির্ঘাত গো-ভূত । হাড় খায় ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বিজ্ঞান নেশানো না হচ্ছে

প্যাডেল না ঘুরিয়েই

একসময় সাধারণ বাইসাইকেলের সঙ্গে ছোট একটি মোটর জুড়ে চালানোর বেশ রেওয়াজ ছিল। মোটরের ঘূর্ণায়মান ছোট্ট চাকতি সাইকেলের পেছনের চাকার টায়ারের সঙ্গে লাগানো থাকত। চাকতি ঘুরলেই তার ঘর্ষণে ঘুঁরত চাকা। প্যাডেল না ঘুরিয়েই দিব্যি তরতর করে এগিয়ে যেতেন আরোহী। বলাই বাহুল্য, মোটরলাগানো সেই সাইকেল গতিতে আসল মোটরসাইকেলের তুলনায় অনেক মন্থর। পুরনো জিনিস যেমন অনেক সময় একটু নতুন চেহারায় দেখা দেয়, ঠিক তেমনই ফিরে এসেছে মোটর-লাগানো সেই সাইকেল। এর মোটরটি একটু উন্নত ধরনের। মোটরের মূল অংশ সাইকেলের

সামনে তেরছা রডের সঙ্গে আটকানো, এবং দুটি ঘূর্ণনক্ষম চাকতি সংলগ্ন সাইকেলের সামনের চাকার টায়ারের দু'পাশে। এই মোটরযোগে সাইকেলের গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২০ মাইল। আর মোটরের রিচার্জেব্‌ল্ ব্যাটারি একবার চার্জ করিয়ে নিলে তার দম থাকে ওই ২০ মাইল পর্যন্ত।

নতুন ধরনের অ্যান্টেনা

এখন ছোট মাপের ইন্ডোর অ্যান্টেনার প্রচলন বাড়ছে, যা টিভি সেটের সঙ্গেই সংলগ্ন থাকে। ইন্ডোর অ্যান্টেনাও বের হচ্ছে নিত্য নতুন ধরনের। এ-ক্ষেত্রে অভিনব সংযোজন হল স্পাইরাল অ্যান্টেনা। অনেকটা ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো এই অ্যান্টেনার এলিমেন্টগুলি এমন, যাতে সমস্ত চ্যানেল এবং প্রেরককেন্দ্র থেকে অনবরত সংকেত গ্রহণ করতে পারে। এর দরুন টিভিতে ছবি এবং শব্দ দুই-ই হবে উচ্চ মানের।

অভিনব কলম

কম দামের, মাঝারি দামের কিংবা মহার্ঘ কতরকমেরই তো কলম আছে বাজারে। পরীক্ষার সময় পাতার পর পাতা লিখতে কিংবা পুজোয় মরসুমে লেখকদের যখন রাতারাতি মস্ত-মস্ত গল্প-উপন্যাস শেষ করতে হয়, তখন কব্‌জিতে ব্যথা হবে না, আঙুলগুলো টনটন করবে না, এমন আদর্শ কলম পাওয়া সত্যিই কঠিন। লেখাকে সহজ স্বচ্ছন্দ করে তোলা এবং লেখকের কব্‌জি ও আঙুলের ওপর

চাপ কমানোর জন্য কলমের ডিজাইনে নানারকম উন্নতিও ঘটাচ্ছেন নির্মাতারা।

এবার এল ডাম্বেলের মতো গলাওয়ালা কলম। সাধারণ কলমেরই ধরার জায়গাটায় রবারের তৈরি ছোট্ট একটি ডাম্বেল লাগানো। এর ফলে লেখার সময় কলম ধরার আঙুল এবং কব্‌জির ওপরে চাপ পড়বে অনেক কম। অনেকক্ষণ ধরে লিখলেও হাত সহজে ক্লান্ত হবে না।

২০ বছর পরে মহাকাশ কর্মসূচিতে ফিরে এল চাঁদ...

চাঁদের মানচিত্র

রেঞ্জার, সারভেয়ার, লুনা এবং সর্বশেষ অ্যাপোলো অভিযানের পর কমবেশি ২০ বছর ধরে মহাকাশ কর্মসূচিতে আমাদের ঘরের কাছের চাঁদ প্রায় উপেক্ষিতই ছিল। এবার সেই উপেক্ষার অবসান ঘটছে। চন্দ্রবক্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরির জন্য গত জানুয়ারির শেষাশেষি রওনা হয়ে গিয়েছে 'ক্লিমেনটাইন' নামে একটি উপগ্রহ। ২২০ কিলোগ্রামের উপগ্রহটিকে একটি টাইটান রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর চারদিকে দু'বার আবর্তন করার পর সেটি চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। ক্লিমেনটাইন চাঁদের চারদিকে তার মেরুকেন্দ্রিক এক কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে দু'মাস ধরে চাঁদকে পরিক্রমণ করতে থাকবে এবং ক্যামেরা-চোখ দিয়ে জরিপ করতে থাকবে ক্ষতলাঞ্ছিত চন্দ্রপৃষ্ঠ। এবং এই উপগ্রহ প্রেরিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলবেন চাঁদের বিস্তারিত ম্যাপ। চাঁদের কক্ষে দু'মাস কাটিয়ে ক্লিমেনটাইন রওনা দেবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুবলয়ের দিকে। 'জিওগ্রাফোস' নামে একটি গ্রহাণুকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করাই তার লক্ষ্য। গ্রহাণুটি অনেকটা আলুর মতো দেখতে, লম্বায় তিন থেকে চার কিলোমিটার, প্রস্থে দেড় কিলোমিটার। যেসব গ্রহাণু পৃথিবীর কক্ষ দিয়ে চলে যায়, জিওগ্রাফোস তাদের অন্যতম। ক্লিমেনটাইন এই গ্রহাণুটির মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে-যেতে অন্তত হাজার দুয়েক ছবি তুলবে। এর আগে এত কাছ থেকে কোনও গ্রহাণুকেই দেখা সম্ভব হয়নি। চাঁদ ও গ্রহাণু পর্যবেক্ষণের এই কর্মসূচির নাম, 'ডিপ স্পেস প্রোগ্রাম সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট'। এটি আমেরিকার ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন এবং নাসা-র যৌথ কর্মসূচি।

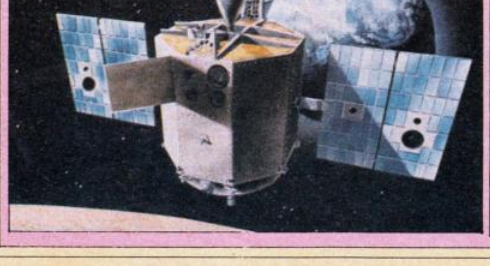

100 লিটার বেবী পফ
ফুটফুটে বিস্ময়!

নতুন 390 লিটার
ভারতের বৃহত্তম রেফ্রিজারেটর

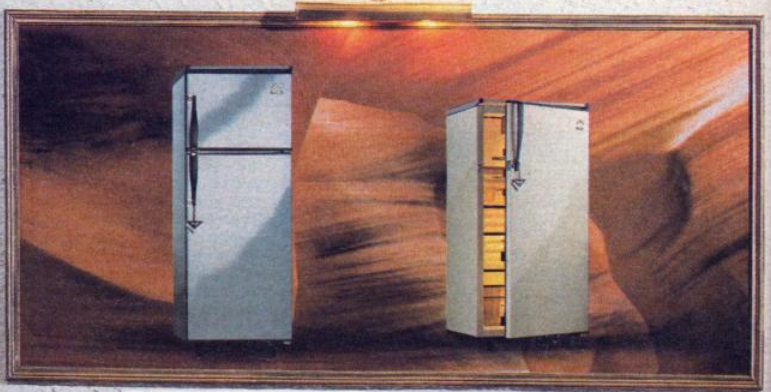

230 লিটার কম্প্যাক্ট ডাবলডোর
ফ্রীজার প্লাস রেফ্রিজারেটর

300 লিটার সুমো পফ
দরাজ জায়গা, দেদার সুবিধা

গোদরেজ কোল্ড গোল্ড-এর তরফ থেকে পেশ হ'ল ভারতের শ্রেষ্ঠ রেফ্রিজারেটর সম্ভার। পফ-এর অনবদ্য অবদান। যার সুবিস্তৃত শ্রেণী ও সুনিপুণ প্রযুক্তি আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে রীতিমত কিংবদন্তী।

EXTRA WIDE EXTRA DEEP

এর **বেশি চওড়া** ও **বেশি গভীর** ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যগুণেই কোল্ড গোল্ড কালেকশন একেবারে আলাদা ধরণের, যা আপনাকে দেয় দরাজ জায়গা, **অটো-ডিফ্রস্টের** সঙ্গে আপনাআপনি জল উবে যাবার সেল্ফ-ড্রেনিং সুবিধা, আর **'একেতেই অনেক'** সুবিধার বৈচিত্র্যবহুল প্রযুক্তিকুশলতা।

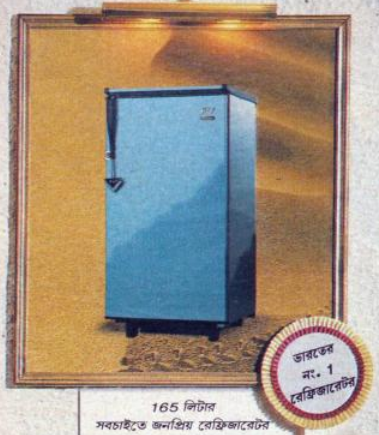

ডিজাইনের বৈচিত্র্য।

আপনার দরকারমত আপনি এর ডিজাইন অদলবদল করে নিতে পারেন। শেলফগুলো আগেপিছে করে সামান্য হেরফের করে নিলেই হ'লো!

রঙের বৈচিত্র্য।

কোল্ড গোল্ড কালেকশন পাবেন 7টি নজরকাড়া রঙে। প্রত্যেকটিই এপোক্সি পাউডার কোটেড ফিনিশে অপরূপ, বছরের পর বছর ধরে নতুনের মত একেবারে।

বাছাইয়ের বৈচিত্র্য।

এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে পাঁচ-পাঁচটি মাস্টারপীস, প্রত্যেকটি পরিবারের সুবিধেমত সাইজে।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে চলে আসুন নিকটস্থ গোদরেজ ডীলারের কাছে। কোল্ড গোল্ড কালেকশন দোকান আলো করে সাজানো আছে। পছন্দমতটি বেছে নিন, পফ অদলবদল করার সবিশেষ অফারের লাভ ওঠান। আর বাজারের আসল সওদাটি ঘরে নিয়ে যান।

Puf EXCHANGE OFFER
GIVE
TAKE

Godrej®

COLD GOLD

Puf সজ্জিত

সুখী জীবন আপনার, এইতো আমাদের অঙ্গীকার

বাইরের জানালা

বায়ুদূষণ রোধে জাপানে নতুন ব্যবস্থা

বায়ুদূষণের সবচেয়ে বড় কারণ গাড়ির ধোঁয়া। এ থেকে মুক্তির উপায় বের করতে জাপান তৎপর।

লিখেছেন সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকে জাপানে হাইওয়ের পাশ থেকে পেট্রল পাম্পগুলি একের পর এক উঠে যেতে শুরু করবে, আর তার জায়গা নেবে ব্যাটারি চার্জার স্টেশন। না, এটা কোনও কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়। জাপান সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ও-দেশে ধীরে-ধীরে প্রচলিত পেট্রল বা ডিজেলচালিত গাড়িগুলির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। আর রাস্তা ছেয়ে যাবে বৈদ্যুতিক বা মিথাইল অ্যালকোহলচালিত এঞ্জিনের গাড়িতে। ব্যাটারি এবং মিথানলচালিত গাড়ির উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি বলে এখনও এগুলি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হয় না। জাপানি বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তিকে সহজ করার গবেষণা চালাচ্ছেন। ও-দেশের সরকার এই গাড়ির উৎপাদনের উন্নতিতে বিশাল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করেছেন। কোম্পানিগুলিকেও গাড়ির দাম যথাসম্ভব কম রাখার আবেদন করা হয়েছে।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বায়ুমণ্ডল দূষণে কলকারখানার চেয়ে মোটরগাড়িই বেশি দায়ী। বিভিন্ন ধরনের গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন কণা এবং তৈল বাষ্প ছাড়াও বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও নাইট্রোজেনের কয়েকটি অক্সাইড প্রতিনিয়তই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে দিচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়া তবু একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দূষণ রোধের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই ধোঁয়াকে অনেকটাই শুদ্ধ করা যায়। কিন্তু মোটরগাড়ি তো এক জায়গায় থেমে থাকে না। আর এ যত পুরনো হয়, দূষণের মাত্রা ততটাই বাড়তে থাকে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে গাড়ির ধোঁয়ায় নাইট্রোজেনের পাঁচটি অক্সাইড থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। আপাত নিরীহ নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইসব গ্যাস অ্যাজমা বা হাঁপানির সৃষ্টি করে, বাড়িয়ে দেয় এই রোগের প্রকোপ।

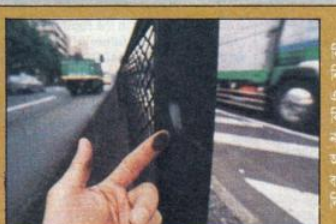

বিভিন্ন ধরনের গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন কণা এবং তৈল বাষ্প ছাড়াও বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও নাইট্রোজেনের কয়েকটি অক্সাইড প্রতিনিয়তই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে দিচ্ছে।

বায়ুমণ্ডল দূষণে গাড়ির ধোঁয়াই বেশি দায়ী

বায়ুদূষণকারী এই ক্ষতিকারক বস্তুটিকে ঠেকাতে জাপান এখন উঠেপড়ে লেগেছে। আপাত-প্রতিকার হিসেবে সপ্তাহে একদিন মোটরবিহীন দিন হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে গাড়ির মালিকদের কাছ থেকে খুব একটা সাড়া মেলেনি। এখন জাপান সরকার গাড়ির ওপর অতিরিক্ত পরিবেশ-কর বসানোর কথা চিন্তা করছেন। যে-গাড়ির এঞ্জিন যত পুরনো আর কালো ধোঁয়া ছাড়বে, তার ট্যাক্স হবে তত বেশি। আমাদের দেশেও পরিকল্পনাটা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

বিমল কর

বিকেল ফুরোতেই আবার তোড়জোড় শুরু হল।

কুমারসাহেবের ড্রাইভার পাকা লোক। আমরা নজর করে দেখেছি, গাড়ি নিয়ে বেরোবার অনেক আগে থেকেই ড্রাইভারজি গাড়িটার তদারকি সেরে নেয় ভাল করে। এঞ্জিন দেখে, তেলকালি মুছে নেয়, ব্যাটারি পরখ করে, জল দেখে রেডিয়েটরের। তেল তো অবশ্যই দেখা দরকার। চাকার হাওয়া ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেয়।

ড্রাইভারজি হল ছত্রিশগড়ের লোক। দেখতে গাঁটাগোট্টা। মুখের আদল অনেকটা বর্মিদের মতন। কেমন যেন চ্যাপটা-চ্যাপটা। ভাঙা বসা নাক, চোখ দুটি গোল-গোল। ওর নাম, আখলা।

আখলা বলল, "গাড়ির তেল কম রয়েছে। বিশ-পঁচিশ মাইলের বেশি ঘোরাফেরা করা যাবে না। বড় ক্যান করে যে তেল আনা হয়েছিল তা শেষ। আবার তেল আসবে ক্যানে, আসবে বাসে— ত্রিবেদীজি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন— বাসস্টপে গিয়ে সেই তেল নামিয়ে আনতে হবে। এসব আগামীকালের কথা, আজ যতটা তেল আছে তাতেই কাজ চালাতে হবে।"

কুমারসাহেব বললেন, "অলরাইট, আমরা আজ দশ-বারো মাইলের মধ্যেই রাউন্ড মারব। রাস্তা একই। খুব নজর করে দেখব— কোনও শর্ট ওয়ে আছে কি না!"

"মানে?"

"জঙ্গলের গাছ, ঝোপঝাড় অনেক সময় অন্য রাস্তা আড়াল করে রাখে, তাই না কুমারসাহেব?" আনন্দ বলল।

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব, হেসে বললেন, "জঙ্গল বড় ভুলভুলাইয়া জায়গা!" বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন। কাল, তেলের নতুন ক্যান আসার পর গাড়িতে তেল ভরে তিনি একেবারে পুরো চক্কর মেরে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে মিলিটারি-মার্কা ওই ছাউনির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁর ধারণা, এইদিক দিয়ে— মানে পুবের দিক দিয়ে ওই ক্যাম্পে যাওয়া যাবে না। পশ্চিম দিয়ে যাওয়া যাবে। আর যাই হোক, ক্যাম্পের লোকদের জন্য আসা-যাওয়ার রাস্তা তো নিশ্চয় আছে। এমন তো হতে পারে না যে, ওখানকার লোকগুলোকে একেবারে আইসোলেট করে রাখা হয়েছে। অসম্ভব!

আমি বললাম, "কিন্তু এমন যদি হয়— স্থলপথে কোনও যোগাযোগ রাখা হয়নি।"

কুমারসাহেব হেসে উঠলেন, "হয় না, তা হয় না। ওটা কোনও দ্বীপ নয়।"

আমাদের বেরোতে-বেরোতে বিকেল শেষ হয়ে এল। তবে আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। আজ কোনও তাড়াহুড়ো নেই। বেশি দূর তো আমরা যাব না। উপায় নেই। তবে আমার মনে হল, যে-কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি, অন্ধকার হয়ে গেলে সে-কাজ হবে কেমন করে! বনজঙ্গলের ভেতরটাকে কুমারসাহেব বলেছেন ভুলভুলাইয়া। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ওই বনজঙ্গলের মধ্যে— গাছপালা, ঝোপঝাড়ে আড়ালে যদি কোনও চোরা পথ বা শর্টকাট রাস্তা থেকেই থাকে— তবে আমরা অন্ধকার হয়ে গেলে দেখতে পাব কেমন করে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে জোরালো টর্চ আছে, আছে গাড়িতে স্পট লাইট। তা থাকুক, দিন-দুপুরের আলোয় গাড়িতে যেতে-যেতে যেভাবে চারপাশ নজর করা সম্ভব অন্ধকার হয়ে গেলে সেটা সম্ভব নয়। কুমারসাহেব যে এসব বোঝেন না তা নয়, তবু তিনি যখন বলছেন— বেরনো গেল।

অন্যদিকে গাড়ি যে-পথে যায় সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে— সিকি মাইল কি আধ মাইল— গাড়ি থেমে গেল। কুমারসাহেব থামাতে বললেন। তখনও ফিকে আলো ছিল।

গাড়িতে বসেই সামনে বাঁ দিকে তাকালেন কুমারসাহেব। পাঁচ-সাতটা বড়-বড় গাছ গায়ে-গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে ঝোপ। গাছগুলোর মধ্যে নিম আর অশ্বত্থগাছ আমি চিনতে পারলাম— বাকি পারলাম না।

কুমারসাহেব কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে ড্রাইভার আখলাকে নেমে গিয়ে দেখতে বললেন কী যেন।

আখলা নেমে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে পাঠালেন, সার?"

কুমারসাহেব বললেন, "কাপড়া পড়ে আছে ওখানে? কিসের কাপড়া?"

আখলা ঘোরাফেরা করে ফিরে এল। বলল, "ছেঁড়া গামছার একটা টুকরো পড়ে আছে। মিট্টি লাগানো।"

কুমারসাহেব নিজে নেমে গেলেন। একটা কাঠি কুড়িয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন জিনিসটা। ফিরে এসে বললেন, "গামছার টুকরোই। লাল রঙের। মাটিতে জলে রোদ্দুরে বোঝার উপায় নেই আর রং। কোনও দেহাতি লোকের গামছা হবে। এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে কখনও। না, ওখান দিকে কোনও পায়ে চলা পথও নেই।"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

চলতে-চলতে একজায়গায় বড়-বড় পাথর চোখে পড়ল। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই। পাথরগুলো এলোমেলো পড়ে আছে। যেন এখানে একটা পুঁচকে পাহাড় তৈরি হয়ে উঠছিল কোনও

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস' প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী, রমন, বিল্লু, পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যাগুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভুত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গাব্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

এবার এল কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি দারুণ চরিত্র–'শ্রীমতিজী! শ্রীমতিজী এবং ওর স্বামী কিশোরের মজার-মজার কান্ডকারখানা দেখে ও পড়ে হাসিতে লুটোপুটি খান।

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-3 ষ্টলে হাজির হয়ে গেছে। মূল্যঃ 8/-

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

সময়ে। পাথরগুলো এমনভাবে সাজানো যে, একটার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়— গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না।

কুমারসাহেব আমাদের নামতে বললেন।

নামলাম আমরা।

পাথরগুলোর কাছাকাছি গিয়ে আনন্দ বলল, "এগুলো কী পাথর ? এত কালো ?"

কুমারসাহেব বললেন, "বর্ষাকালে জলে ধুয়ে-ধুয়ে ওই রকম দেখাচ্ছে। ধুলোময়লা নেই। সাফসুফ।"

দুটো বড়-বড় পাথরের তলা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামান্য। পায়ের তলায় ছোট-ছোট পাথর, পাথর টপকে-টপকে এগোতে হচ্ছিল। কোথাও-কোথাও ঘাস গজিয়েছে, কোথাও বা কাঁটাঝোপ। বড় দুই পাথরের মাঝপথ দিয়ে এপারে এসে দেখি সামনে যেন বিশাল মাঠ। অবশ্য পাথরে-পাথরে ভরতি। পাহাড়ের নীচে যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল, একটা মাথাভাঙা গম্বুজ মতন কী দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দির নাকি !

আনন্দ নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করেছে, দেখেছে অনেক কিছু। সে বলল, "মন্দির নয়, ভাঙা রথ।"

"রথ !"

"নীচে দুটো চাকা দেখছিস না !"

"পাথরের চাকা। এখানে কোনও সময়ে নিশ্চয় কোনও যুদ্ধটুদ্ধ হয়েছিল।"

"এই পাথুরে জায়গায় যুদ্ধ !"

"রথ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কোন বইয়ে যেন পড়েছি, আগেকার দিনে কোনও-কোনও রাজারাজড়া যুদ্ধ করে জিতলে অনেকেই একটা রথ বানিয়ে রেখে যেতেন। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন। বিজয়রথ রে ভাই !" বলে আনন্দ হাসল।

কুমারসাহেব বললেন, "না, না, আনন্দ। যুদ্ধ নাও হতে পারে। দু-তিনশো বছর আগে এখানে কোনও মঠ-মন্দির থাকতে পারে। পাহাড়ের তলায় পাথর জোটানো সহজ, কাজেই পাথরের তৈরি মঠ-মন্দির গড়ে উঠত।"

আমরা আরও একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রায় যেন চোখের পলকে আলো মরে গেল। অন্ধকার।

দূরে পাহাড়ের ঢাল চলে গিয়েছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ওধারে অন্ধকার।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো, ফেরা যাক।"

টর্চ আমাদের সঙ্গেই ছিল। ফিরে এলাম সাবধানে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি, কখন যে সন্ধে নেমে গেল বুঝতেই পারলাম না। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

গাড়ি নিয়ে ফেরাই উচিত ছিল। কুমারসাহেবের খেয়াল হল, আরও একটু এগিয়ে তবে ফিরবেন।

এই সময় বাতাস উঠল। ঝোড়ো বাতাস নয়, আমাদের বাংলাদেশে শরৎকালের সন্ধের বাতাসও নয়। এই বাতাস কেমন গা শিরশির করানো। অনেকটা হেমন্তকালের মতন। হেমন্তকালের মতনই হালকা কুয়াশাও যেন গাছপালার ডালে-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে জমে উঠছিল।

আমরা ফিরেই আসছিলাম, হঠাৎ এক শব্দ কানে গেল।

আনন্দই প্রথমে খেয়াল করেছিল। "কিসের শব্দ না ?"

আমরা কান পাতলাম।

সত্যিই একটা শব্দ। মাটিতে নয়, আশেপাশে নয়, আকাশে।

আকাশের কোনও কোণ থেকে শব্দটা আসছিল।

"এরোপ্লেন ?"

"কই, কোথায় ?"

প্লেন হলে কি অনেক দূরে আছে ? এত মৃদু শব্দ !

আকাশে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, "প্লেনের তলায় তো দুটো আলো থাকে দেখেছি, লাল আর সবুজ, মিটমিট করে জ্বলে, তারার মতন। আলো কই ?"

আলোর কোনও চিহ্ন নেই। শুধু তারাই চোখে পড়ে আকাশে।

শব্দটা সামান্য জোর হল। হলেও প্লেনের মতন নয়। ওই শব্দ শুনলে মনে হবে মাথার ওপর ভোমরা উড়ছে যেন।

আশ্চর্য !

কুমারসাহেব তাকিয়ে থাকলেন আকাশের দিকে। আনন্দ বোকার মতন টর্চ ফেলল শূন্যে।

আমার যে কী মনে হচ্ছিল কে জানে !

আনন্দ বলল, "কৃপা, এখন কৃষ্ণপক্ষ না ?"

"হ্যাঁ !" আমি বললাম। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যেই আমরা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। পাঁজিপুঁথি পরে আর দেখিনি।

আমার হিসেবে এখন হয় চতুর্দশী বা অমাবস্যা। ত্রয়োদশী হতে পারে। চতুর্দশী বলেই মনে হল।

কুমারসাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বললেন, "শব্দটা পাহাড়ের দিকে।"

"মানডিগড়ের দিকে ?"

"হ্যাঁ, ওইদিকেই।"

"কিসের শব্দ ?"

"প্লেনের। শুনেছি যুদ্ধের সময় এইরকম চুপচাপ জাপানি প্লেন আসত বহুত উঁচু দিয়ে আমাদের বর্ডার এরিয়ায়।"

"এ তো আর জাপানি প্লেন নয় !"

"না।"

"তবে ?"

কুমারসাহেব সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমাদের প্লেন। মাস্ট বি আওয়ার প্লেন। ওই মিলিটারি বেস্‌টায় আসছে।"

"মানডিগড়ে।"

"শিওর।"

"আলো নেই কেন ?"

"কী জানি !"

"এ যেন সার, লুকিয়ে চুপিচুপি আসা !"

"হ্যাঁ।"

"নামবে কেমন করে ?"

"নীচে— মাটিতে কোনও আলো দেওয়া আছে নামার জন্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

কথাবার্তার মধ্যেই আচমকা আমাদের চোখে পড়ল— মিহি এই আলো— আবছা জ্যোৎস্নার মতন পাহাড়ের ওপাশে যেন ফুটে উঠল। ওই আলো দেখলে মনে হবে, বৃষ্টির জলকণায় ভেজা একেবারে নরম ধোয়া-ধোয়া চাঁদের আলো।

আমার কেমন গা ছমছম করে উঠছিল। উত্তেজনাও বোধ করছিলাম হয়তো।

শব্দটা ক্রমশ কমে আসতে লাগল।

আমরা উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম।

এক সময় সবই নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝি ডাকছিল গাছপালার আড়ালে। (ক্রমশ)

ভূতের গল্প

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছে হলেও বেশ গ্রাম-গ্রাম। পশ্চিমে গঙ্গা। সেদিকে সব মন্দির, বাগানবাড়ি, বাঁশ-বিচালির গোলা। পশ্চিম থেকে একটি মাত্র পিচ বাঁধানো রাস্তা পুবে বাসরাস্তার দিকে চলে গেছে। বাকি সব অলি-গলি, গলির গলি তস্য গলি। পাকা বাড়ি, সাবেক কালের বাড়ি অনেক ছিল, আবার সেই সঙ্গে ছিল, টিন, টালি, খড়ের চালা। বড়-বড় গাছ। নিম, তেঁতুল, বট, অর্জুন। জংলা অবসর্তি, বাগান। একটা বাগান ছিল, সেখানে শুধু কুল গাছ। আমরা সেখানে শীতকালে কুল চুরি করতে যেতুম। হরি মালী তাড়া করলে, মার দৌড়। ধরবে কী করে, আমরা যে ছোট ছিলুম, হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম। কিছু না পেরে হরিদা চিৎকার করে বলত, "সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া, দাঁড়, মা কালীকে বলে দেব।"

সেই সময় একদিন আমাদের বন্ধুমহলে খবর রটে গেল, আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। সেটা কী জিনিস! বিমানই এই গোপন খবরটা এনেছিল। সে সব জানে। বিমান বললে, জমিদার অনাদি মল্লিকের এখন-তখন অবস্থা। অত বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি। তাঁকে তো সহজে মরতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিয়ে গেছেন। তাই এই শেষ চেষ্টা। অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচানো হবে। এক তান্ত্রিক এসেছেন পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে। সারা গায়ে তেল-সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বেরোবেন। হাতে থাকবে জলসমেত মুখ খোলা একটা ডাব। তিনি পল্লীবাসী সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকবেন একে-একে। প্রত্যেকের নাম তিনবার করে ডাকবেন। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনই ডাবের খোলার মুখটা টপ করে চাপা দিয়ে দেবেন। অমনই তার প্রাণ ওই ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন আর এ মারা যাবে।

বিমান বললে, "খুব সাবধান! আজ আমরা সারা রাত জেগে থাকব। ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিস, কি মরেছিস।"

"পশুপতিনাথের তান্ত্রিক আমাদের নাম জানবে কী করে!"

"এ-পাড়ার লোকই জানিয়ে দেবে। লিস্ট ধরিয়ে দেবে।"

বাড়িতে এসে মাকে খুব চুপিচুপি কথাটা বললুম। বাবা খুব কড়া মানুষ। ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র মানেন'না। শুধু বলবেন, "অঙ্ক কষো, অঙ্ক। অঙ্কই জীবন, অঙ্কই ভগবান।" আর ওই অঙ্কটাই আমি পারি না। তাই বাবাকে না বলে মাকে বললুম। তা ছাড়া মায়ের চেয়েও বড় বন্ধু মানুষের আর কে আছে!

মা খুব ভয় পেলেন। মায়ের ছেলেবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা এইসব অলৌকিক ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। সিঙ্গুরে একবার ভুলভুলাইয়া ভূত মাকে সারারাত জঙ্গলে ঘুরিয়েছিল। আধমাইল দূরে মায়ের বাড়ি, মা কিন্তু কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না। ভুল রাস্তায় সারারাত চক্কর মারলেন।

সব শুনে মা বললেন, "আমরা তো জেগে থাকবই, তবে একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সে তোর বাবা। যদি জানতে পারে সারারাত লাঠি হাতে রাস্তার রকে বসে থাকবে। এলেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, তারপর যা হয় হবে। না জানানোই ভাল। সেখানেও ভয়, ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে উত্তর দিয়ে দিলেই হয়ে গেল।"

আমি বললুম, "বাবার পাশে আমিই তো শুই। জেগেই থাকব। যদি দেখি উত্তর দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চেপে ধরব।"

আমাদের রাত জাগার সব পরিকল্পনা প্রস্তুত। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারের বটতলায় বসে ওই একই আলোচনা হল। সন্ধে হব-হব, বাড়ি ফিরে এলুম। চারপাশ এরই মধ্যে কেমন যেন থমথম করছে। কালীবাড়িতে অমাবস্যার রাতের পুজোর আয়োজন হচ্ছে দেখে এসেছি। অন্য অমাবস্যায় আমরা বন্ধুরা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি-ভোগ খাওয়ার লোভে ঠিক হাজির হয়ে যেতুম। সে রাত বারোটাই হোক, একটাই হোক। আজ আর কোনও বেরনো-টেরনো নয়। টাইট হয়ে বসে থাকো বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকার হয় ঠিকই, তবে আজ যেন আলকাতরা-রাত। ঘরের জানলায় আকাশটা আটকে আছে, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তারাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছে ধকধক করে। রাস্তাতেও আজ যেন তেমন লোক চলাচল নেই। রাত ন'টার আগেই সব যেন নিঝুম মেরে গেল। দোকানপাট বন্ধ। মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের ছেঁচা বেড়ার দরজাটা খোলা। মাঠে আলো পড়েছে। মজা পুকুর। কচু গাছের ঝোপ। কালো কুকুরটা কড়ার চাঁছি খাওয়ার লোভে সামনের থাবায় মুখ রেখে বসে আছে। এই সবই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের জানলায় বসে।

রাত দশটার সময় মা বললেন, "দেখছিস পলাশ, আজ এরই মধ্যে ঘুমে শরীর যেন ভারী হয়ে আসছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না!"

"মনে হচ্ছে না আবার! ইতিহাস পড়ছিলুম, এমন ঢুল ধরল, মাথাটা টাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে গেল। তাই তো এই জানলায় এসে বসে আছি।"

"বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা! সারা পাড়াটাকে মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আস্তে-আস্তে।"

"কীভাবে করে মা?"

"আমি জানি। খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠে বিশাল একটা ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো দিতে থাকে। তার সঙ্গে মন্ত্র। যেদিকে বাতাস সেই দিকে ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মানুষের শরীর ভারী হয়। ঘুম পায়। বেশ একটা সুখ-সুখ লাগে। এই সুখের মধ্যে থেকেই একজন চলে যায়।"

"এর হাত থেকে বাঁচার উপায়?"

"আমার জানা আছে। লঙ্কা পোড়া।

দাঁড়া, চাটুতে কয়েকটা লঙ্কা পোড়াই। সব প্রভাব কেটে যাবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধ সবাই হাঁচি আর কাশিতে অস্থির। আমাদের পুসিটা একপাশে থুপ্‌পি মেরে ঘুমোচ্ছিল। ফিঁচ-ফিঁচ করে হাঁচতে-হাঁচতে উঠে বসল। অবাক হয়ে গেছে। রাত দশটার সময় এ আবার কী! বাবা বাইরের ঘর থেকে ছুটে এলেন, "কী করছ কী তুমি! এরপর লোকে যে থানায় ডায়েরি করবে আমাদের নামে।"

মা শুধু গম্ভীর মুখে একটা কথাই বললেন, "যা করছি সবই জীবের মঙ্গলের জন্যে।"

"এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে!" বলে, বাবা উদ্দাম কাশতে-কাশতে পালিয়ে গেলেন। মন্দিরে অমাবস্যার রাতের পুজো শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, জগঝম্পের শব্দ ভেসে আসছে।

রাত এগারোটার সময় রোজ যেমন আমরা শুয়ে পড়ি, সেই রকমই শোয়া হল। আলো-টালো সব নিভে গেছে। এক বিছানায় বাবা আর আমি পাশাপাশি। আর-এক বিছানায় মা। দোতলার ঘর। ঠিক নীচেই রাস্তা। গরম কাল। জানলা-টানলা সব খোলা। বাবার শ্বাসপ্রশ্বাস যেই বড় হল, মা মশারির ভেতর থেকে ফিসফিস করে ডাকলেন, "পলাশ!"

"সব ঠিক আছে মা।"

"সাবধান, সজাগ থাকিস।"

"ঠিক আছে মা।"

বাবা পাশ ফিরলেন। আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলুম। মন্দিরের আরতি শেষ। রাত নিঝুম। কোথাও একটা কুকুরও আজ ডাকছে না। শুধু দেওয়াল ঘড়ির ঠকাস-ঠকাস শব্দ। ঠাং করে একটা বাজল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আর বোধহয় জেগে থাকতে পারলুম না। আমাকে সাবধান করে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জোরে-জোরে নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ভীষণ ভয় করছে আমার।

রাত দেড়টা। আজ আর বোধহয় নিশি বেরোল না। সবটাই গুজব। এমনও হয় না কি! এই সব ভেবে সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময় দূরে কোথাও চিং করে একটা শব্দ হল। আমার কান খাড়া। বিছানায় আধশোয়া। গম্ভীর গলায় কে টেনে-টেনে সুর করে ডাকছে, "অনাথ, অনাথ।" তিনবার। পরের নাম, "দীনবন্ধু, দীনবন্ধু।" গলাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ডাকতে-ডাকতে। আমাদের বাড়ির সামনে। বাবার নাম ধরে ডাকছে, "হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর।" আমার হাত বাবার ঠোঁটের কাছে। তেমন হলেই চেপে ধরব।

খুব ইচ্ছে করছে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারছি না তাই। ডাকটা ক্রমশই গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে, "কানাই, কানাই, বনমালী, বনমালী, হারাধন, হারাধন।" শেষে আর শোনা গেল না। বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দ। গঙ্গায় শেষ রাতের স্টিমারের ভোঁ। ডাকটা কী আবার এদিকে ঘুরে আসবে! এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বাইরের রাস্তায় লোকজন, হইচই। রাতের অতবড় একটা ঘটনার কোনও চিহ্নই পড়ে নেই। আরও একটু বেলা বাড়তেই পবিত্রদের বাড়ি ছুটে গেলুম। ওইখানেই আমাদের আড্ডা বসে। তারপর ওইখান থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে আমরা গঙ্গায় গিয়ে পড়ি।

সেদিন আর কোনও আলোচনা নয়। একটাই বিষয়, নিশির ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল! না, নিশি ডেকে-ডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল! আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম। ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস তো করা যায় না, কে মারা গেছে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে।

এ পাড়া-সে পাড়া, এ গলি-সে গলি ঘুরছি আমরা। জীবন স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই। তার মানে সব বাজে। কোনও এক পাগলের কীর্তি। বিমান আবার সাহস করে দোতলার বারান্দা থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিশি দেখেছে। বেঁটেখাটো, চারচৌকো, জটাজুটধারী একটা জীব। দগদগে লাল। বেলুনের মতো রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছে। শেয়ালের মতো কণ্ঠস্বর, "নিতাই, নিতাই।"

পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে দু'জন কাজের মেয়ে বলাবলি করছে, কুলবাগানের হারু কাল শেষ রাতে হঠাৎ মারা গেছে। রাতে খাটিয়া পেতে দাওয়ায় শুয়েছিল। সুস্থ, সবল একটা মানুষ। অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সকালে দেখা গেল, বিছানায় মরে পড়ে আছে।

ছোট-ছোট। হারুদার কুলবাগান। গাছের পর গাছ। গোল-গোল পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে প্রখর সূর্যের আলো। ছায়া আছে, তবে কেমন যেন শুকনো ছায়া। মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। খবর পেয়ে কিছু লোকজন এসেছে। খাটিয়ায় চিত হয়ে পড়ে আছে আমাদের হারুদা। চেহারাটা কাগজের মতো ফ্যাকফ্যাকে সাদা। সবাই বলাবলি করছে, হার্ট অ্যাটাক।

একমাত্র আমরাই জানি ব্যাপারটা কী! রাত দুটোর সময় মৃত্যুর কণ্ঠস্বর— "হারুউ, হারুউ।" আধো ঘুম, আধো জাগরণে একটি উত্তর— "যাই।" খপ করে ডাবের খোলার মুখ বন্ধ।

এখন ভাবি, এমনও হয়! কিন্তু তার পরে অনাদি মল্লিক আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

ভূতের গল্প

মানুষই ভূত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং ভূপতির শরীর ভাল যাচ্ছে না। জ্বর-জ্বালা, কিছুদিন বুকে সর্দি বসে গিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছে। শরীরে আর আগের মতো জোর পায় না। একা দূরে যেতেও কেমন তার ভয় লাগে। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হয়। বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারেনি। মা একবার নিজে ঘুরে গেছেন, তারপর চিঠি, সে চিঠির কোনও জবাব দেয়নি। ছোটপুত্রের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে মা ঘুরে গেছেন, তাও বোঝে ভূপতি। "এবারের মতো দে, আর বলব না। চোখের সামনে আমি আর এত কষ্ট দেখতে পারছি না। কিছু একটা যদি করে বসে, এটাই শেষ চেষ্টা। দে বাবা। শত হলেও তোর ছোট ভাই, সব আঙুল কি সমান হয় রে বাবা।"

ভূপতি রা করেনি। তার আর অনটনের কথা শুনতেও ভাল লাগে না। এমনিতেই মার আলাদা মাসোহারা, ছোট ভাইয়ের আলাদা মাসোহারা সে পাঠায়। সম্প্রতি অবসর নেওয়ায় তার নিজের সম্পর্কেও চিন্তা বেড়েছে। হুট করে চাইলেই দেওয়া যায় না। নিজের সংসারের দায়ও কম নয় তার।

"কী রে কিছু বললি না যে।"

"কী বলি বলো তো।"

"তুই দিতে পারিস ইচ্ছে করলে। আর কার কাছে হাত পাতবে।"

"দিচ্ছি তো। আর কত ঠেকা দেব বলো।"

"তা দিচ্ছিস বাবা। মাসে-মাসে টাকা নেয় তাও জানি। আমাকে কিছু বলে না। তোর কাছে ঘুরে যায়, বলে কলকাতার মহাজনের কাছে কাজ ছিল। এত মিছে কথা বলতে পারে! ফল বিক্রি করে ক'টা টাকা হয় বল। পাঁচ-পাঁচটা পেট সোজা কথা! সকালে সাইকেল নিয়ে বের হয়, ফিরতে-ফিরতে রাত আটটা-ন'টা। চালের ব্যবসা করবে বলছে, হাজার-আটেক টাকা দিলেই শুরু করতে পারে। আমাকে ধরেছে, কোন মুখে তোর কাছে চাইবে বুঝতে পারিস না!"

"আবার চালের কারবার! নৃপতির কি মাথা খারাপ আছে মা। একবার করে শিক্ষা হয়নি! কত টাকা আমার গচ্চা গেল। থানা, পুলিশ, আদালত, প্রায় এক যুগ ধরে মামলা— কত টানব বলো। কথায়-কথায় নানা অজুহাতে বাবার লাগানো গাছগুলো তোমরা বিক্রি করে দিচ্ছ। কষ্ট হয় না তোমাদের! বাড়ি পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে হয় না। শ্মশানের মতো খাঁখাঁ করছে সব। চার-পাঁচ বিঘের বাড়িটাতে এখন শুধু জঙ্গলের রাজত্ব।"

"কী করি বল, সব কিছুর দাম আগুন। এত বড় ঘর তো করে গেছে, তার মেরামত আছে না! তোর বাবা কি মানুষ ছিল, অপদেবতা বিশেষ। জীবনে কিছু করেছে। শুধু ওই গাছ আর গাছ। গাছ লাগালে কি পেট ভরে রে বাবা।"

ভূপতি জানে, বাবার কথা উঠলে, মার অভিযোগের অন্ত থাকবে না। বাবার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই সে শুনতে চায় না। শুনতে তার ভালও লাগে না। বাবা মারা গিয়েও মার চোপাতে সারাদিন অস্থির থাকেন। সামান্য অভাব অভিযোগে, বাবাকে ধরে টানবেন। "কী গাছ খাওয়াচ্ছে না! সারাজীবন বসে-বসে খেলে, উপার্জন করলে না এক পয়সা। এখন পুত্রের মুখাপেক্ষী। টাকা পেলে রমরমা, না পেলে হা-পিত্যেশ। সারা জীবন গাছপাগল হয়ে থাকলে। দেব সব গাছ কেটে।"

চিঠি মার।

'ঝড়-বৃষ্টি-বাদলায় মাটির দেওয়াল রাখা যাচ্ছে না। উত্তরের সীতাভোগ আমগাছ বেচে দিলাম। ক'টা টিন পালটাতে হবে।'

আবার চিঠি।

'নৃপতির লোনের টাকা শোধ করতে হবে। অত টাকা পাবে কোথায়! ব্যাঙ্ক লাল চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। নৃপতির এখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। খুবই ফাঁপরে পড়ে গেছে। শ্রীপতি বাড়ি এসেছিল, সে রাজি না। বলে গেছে মেজদা অনুমতি দিলে আমাদের আপত্তি নাই।'

এখন বাড়িটা সাত শরিকের। তবু ভূপতি জানে, নানা কারণেই দাদা এবং ভাইবোনেরা তার মুখাপেক্ষী। সে অনুমতি দিলে, কেউ আর বাধা দেবে না। মারও দোষ দিতে পারে না। চোখের সামনে নৃপতির অভাব-অনটন সত্যি সহ্য করা যায় না। বাড়ির সামনের জমিটায় নৃপতি ঘর তুলে আছে। জমির বন্টননামা হয়নি। সব জমি এবং গাছপালা মা ভোগ করে। মার ওরফে

নৃপতিও কিছুটা ভোগ করে। মার অবশ্য আলাদা একটি গলগ্রহ আছে। ভাইঝি সুনন্দা। মার কাছেই বড় হয়েছে, মার সঙ্গেই থাকে। পড়াশোনা বিশেষ হয়নি। বাবার লাগানো গাছের সঙ্গে এ-বাড়িতে সেও বড় হয়ে উঠেছে। গাছ কাটলে সুনন্দাই বেশি কষ্ট পায় এটাও সে বোঝে।

গাছ যেদিন কাটা হয়, সুনন্দা বাড়ি থাকতে পারে না। সে পিসির বাড়ি চলে যায়। ক্রোশখানেক দূরে পিসির বাড়ি সাইকেলে চলে যাওয়ার আগে সবাই দেখেছে, সুনন্দা কিছুক্ষণ গাছটার নীচে বসে থাকে। ভূপতি বুঝতে পারে, গাছের সঙ্গে বড় হয়ে উঠলে মায়া তো পড়বেই। বাবা গাছও লাগিয়েছেন, সুনন্দাকেও তুলে এনেছিলেন। দাদার সন্তান-সন্ততির মাত্রা একটু বেশি। বড় মেয়েটির প্রতি দাদার মায়া-মমতা কম, টের পেয়েই বোধ হয় বাবা এ-কাজটি করে গেছেন। সুনন্দার দেখতে-দেখতে কত বয়েস হয়ে গেল! এখনও পাত্র জোটানো গেল না। দাবিদাওয়া নিয়ে কম করে লাখ টাকা, কে দেয়! সুনন্দা খুশিই এতে, সে আছে, গাছগুলোও আছে। আম, জাম, লিচু, সবেদা, কাঁঠাল— কী গাছ নেই! সারা বাড়িতে সব গাছপালা মহীরূহ হয়ে গেছে। গাছের ভালবাসায় সেও মজে গেছে। গাছ কাটা হবে ভাবলেই ভূপতির চোখে সুনন্দার মুখ ভেসে ওঠে। এতে সেও কম কষ্ট পায় না। তবু তাকে অনুমতি দিতেই হয়।

নানা অজুহাতে সব গাছই শেষ। আছে একটা অর্জুন গাছ। বাঁশের জঙ্গলে গাছটা বড় হয়েছে নিজের খুশিমতো। সেই গাছটাও বোধ হয় এবারে যায়।

মা নিজের খুশিমতো গাছ দিয়ে দেন।

একবার লিখলেন— 'শ্রীপতি বাড়ি করছে। তার দরজা-জানলার কাঠ চাই। বাজারে কাঠের দাম আগুন। বড় সিঁদুরে গাছটা সে চাইছে।, গাছটা পেলে দরজা-জানলার কাঠ আর তাকে কিনতে হয় না। শ্রীপতি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।'

ভূপতি বোঝে, এই করে সবাই বাবার গাছগুলো শেষ করে দিচ্ছে।

নৃপতি টাকা নিতে এলে বলবে, 'মা টিয়াঠুঁটি গাছটা বিক্রি করে দিল। উত্তরের দিকের গাছ আর একটাও নেই।'

ভূপতি না বলে পারে না, "যা খুশি করুক।"

নৃপতির আরও অভিযোগ, "গাছ তো দাদা আমরাই কাটছি না, মাও কাটছে। লোক দিয়ে এত বড় জামগাছটা জলের দরে বিক্রি করে দিল। মার কী অভাব আছে বল! কেন গাছ বেচে দেয় বল। টাকা, বুঝলি না, গুচ্ছের টাকা সুনন্দার নামে ব্যাঙ্কে ফেলে রাখছে।"

ভাইবিটি নৃপতির চক্ষুশূল। নৃপতির স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই। প্রায় একই উঠোনে নৃপতির ঘর। নৃপতির ছেলেমেয়েরা ওত পেতে থাকে, কখন ঠাকুমা খেতে বসবেন। ঠাকুমাকে ভালমতো খেতে দেয় না। কেড়েকুড়ে সব খেয়ে নেয়। ভূপতি এমনও অভিযোগ শুনতে পায়। সুনন্দা এলে বলবে, "কাকা, আপনি একবার বাড়ি যান। সবাইকে ডেকে বলুন, গাছ যেন কেউ আর বিক্রি না করে। রেষারেষি যত গাছ নিয়ে। ছোটকাকা তো জোর করেই গাছ কাটছে। ঠাকুমার কথা শুনছে না। ছেলে স্কুলে যাবে, সাইকেল নেই। পুকুরপাড়ের গাব গাছটা কেটে ফেলল।"

ভূপতি না বলে পারেনি, "মা কাটতে দিল কেন? মা বাধা দিতে পারত।"

"তা হলেই হয়েছে। নাতির কষ্ট, এতটা রাস্তা হেঁটে স্কুলে যায়, আসে, আপনি অনুমতি যদি না দেন, সেই ভয়ে ঠাকুমাও চিঠি লেখেনি। রোজ ঠাকুমাকে জ্বালায়, আমার একটা সাইকেল কিনে দাও। জেঠুকে চিঠি দাও। জেঠুকে লেখো, আমাকে যেন একটা সাইকেল কেনার টাকা দেয়।"

ভূপতি কুপিত হয়। তার মাথা গরম হয়ে যায়, "তোরা কী ভেবেছিস বল তো, আমি কি টাকার গাছ যে, ঝাড়া দিলেই ঝরে পড়বে। আমরা দেড়-দু'ক্রোশ হেঁটে স্কুল-কলেজ করিনি! আমরা পারলে নৃপতির ছেলে পারবে না কেন?"

"সেটা কে বলে কাকা? আমি এখন ঠাকুমার চক্ষুশূল। বাধা দিতে গেলে ঠাকুমাই চেঁচামেচি করে। তোর গাছ, না তোর বাপের গাছ। আমার কর্তা লাগিয়ে গেছে। গাছ থাকবে কী যাবে আমি বুঝব।' গাছের জন্য দরদ উথলে উঠছে! গাছ না থাকলে বাড়ির শোভা থাকে না। গাছ থাকলে সব জঙ্গল হয়ে যায়। হোক জঙ্গল। বাড়িটাতে আছে কী, কেউ দ্যাখে বাড়িটা!"

ভূপতি চোখ বুজে সব শোনে।

বাবা থাকতে বাড়িটা ছিল তপোবনের মতো। পাঁচ বিঘে জমিতে একটা আগাছা জন্মাতে পারত না। বাড়ির গৃহদেবতার পুজো আর গাছপালার পরিচর্যা ছিল তার নেশা। সব গাছের নাম বাবাই দিয়েছেন। আমগাছই মেলা। জাম, জামরুল, চালতে গাছও আছে। বাবা একটি সুন্দর লেবুর বাগানও করেছিলেন। গন্ধরাজ লেবু পাতে না পড়লে খাওয়ার সুখ থাকে না। পুকুর পাড়ের দিকটায় শুধু নারকোল গাছ আর খেজুর গাছ। খেজুর গাছ বাবা অবশ্য লাগাননি। জলের দরে জমি কেনার পর জঙ্গল সাফ করে একটি মজা পুকুর এবং খেজুর গাছগুলি বাবা আবিষ্কার করেছিলেন। উত্তরের দিকটায় বাঁশের বন ছিল, তা বাবা অক্ষতই রেখেছিলেন। গেরস্থের ঘরে বাঁশ না হলে চলে না।

কত দূরদূর থেকে বাবা গাছের কলম করিয়ে নিজে কাঁধে বয়ে এনেছেন। নাওয়া-খাওয়ার কথা বাবার মনে থাকত না। গাছ লেগে গেলে বাবা বালকের মতো খুশি। একবার বাবা তাকে কলেজেও যেতে দিলেন না। সবে সে কলেজে তখন ঢুকেছে। বাবা ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরে, কাঁধ থেকে গাছের কলমটি নামিয়ে বললেন, "ভূপতি, এই গাছটা তুমি আজ লাগাবে।"

"কাল লাগালে হবে না?"

"হবে না কেন, হবে। তবে গাছের মর্যাদা থাকে না। এত দূর থেকে কাঁধে করে বয়ে আনলাম, গোলাপখাস আমের কলম। খুবই লাজুক স্বভাব। কলম করাই কঠিন। যাও গাছ কলম দিল, তাকে বাড়ি এনে ফেলে রাখলে গাছ কুপিত হবে না!"

তারপর যা কাণ্ড করলেন, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাকে, কলমটি অতি যত্নের সঙ্গে তুলে নিয়ে গেলেন, বাড়ির পুবের দিকের

জঙ্গলটায়। জঙ্গল সাফ করে কোমরসমান গর্ত করে ফেলল। ভূপতি কী আর করে। সে নিজেই তার বাবার কাছ থেকে কোদালটি প্রায় কেড়েই নিল, "তুমি দেখিয়ে দাও, আমি সব করছি।"

"তুমি পারবে না।"

"পারব।"

বাবার তবু অবিশ্বাস। কলমটি লাগাবার সময় যেন কোনও ত্রুটি থেকে না যায়। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করছেন।

"আস্তে নামাও। না না, ঠিক হচ্ছে না। কলমের গোড়াটি কলাপাতায় মোড়া। ওটা আলগা না করে নিলে গাছ জোর পাবে না।"

"দেখবে যেন গাছে চোট না লাগে। আর একটু সোজা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঝুর ঝুরে মাটি চাই। মিহি করে দাও। ফ্যালো, গাছ লাগালে আত্মপ্রত্যয় বাড়ে।"

বর্ষাতেই গাছটি লেগে গেল। বাবা তাকে একদিন গাছটার কাছে নিয়ে গেলেন। সন্তর্পণে অতি যত্নে একটি পাতা হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ তো, কোনও গন্ধ পাস কি না!"

ভূপতি পাতাটি শুঁকে কিছুই টের পেল না।

বাবা বললেন, "এসো এদিকে।"

আরও দুটো গাছের পাতা দিয়ে বললেন, "দ্যাখো তো, এবার কোনও গন্ধ পাস কি না?"

ভূপতি অবাক। কিসের গন্ধ। বাবা তার কেমন গন্ধ চান সে বুঝতে পারছে না। সব আম পাতার যেমন গন্ধ থাকে, এগুলো তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

বাবা হতাশ গলায় বললেন, "গাছটি বাঁচলে হয়। গন্ধই টের পাও না গাছের। আমি তো গাছের পাতা শুঁকে বলতে পারি কোনটায় কোন সিজনের আম ধরবে। গোলাপখাস আর মধুটুকরি পাতার কি এক গন্ধ হয়! একটাতে গোলাপখাস আমের গন্ধ পাবে, আর একটাতে মধুটুকরির। সব গাছের জাত আলাদা, গন্ধ আলাদা। ফুল, ফল আলাদা। আমের জাত না চিনলে গাছ লাগিয়ে কী হবে! গাছ লাগালে মানুষের ভালবাসা বাড়ে, বোঝো। গাছ লাগালে, মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে। গাছ তো শুধু ছায়া দেয় না, শুধু ফুল-ফলও দেয় না। গাছ মানুষের বিবেকও জাগ্রত রাখে।"

ভূপতির কেন জানি বাবার কথা ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল। এগুলো তো শুধু গাছ নয়, বাবার প্রাণ। বাবা এই ফল-ফুলের গাছের ছায়ায় বেঁচে ছিলেন। কোনও কিছুরই অভাব বোধ করেননি। অভাব থাকলেও জীবনে তাঁর কোনও দৈন্য ছিল না। সব দুঃখ-হতাশা বাবা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে জয় করে গেছেন। সময়মতো বাড়ির মাসোহারা পাঠাতে না পারলে বাবা যে অগাধ জলে পড়ে যাবেন, সে বুঝত। নিজের সংসারের টানাটানিতে কত সময় সে বাবার মাসোহারা ঠিকমতো একসময় পাঠাতে পারত না। বাবা কখনও মুখ ফুটে অভাবের কথা প্রকাশ করতে পারতেন না। এত বিচিত্র গাছগাছালি তাঁর নিজের হাতে লাগানো। গাছগুলোর নীচে বসে থাকলে বাবার আত্মতৃপ্তির শেষ ছিল না। এত গাছ যাঁর, তাঁর আবার অভাব কিসের!

পরদিন সকালে উঠেই ভূপতি স্ত্রীকে বলল, "আমি আজই বাড়ি যাচ্ছি।"

স্ত্রী মণিকা বলল, "তার মানে? এই শরীর নিয়ে একা যাবে? গেলেই হল। সর্দি, কাসি, জ্বরে কবে থেকে ভুগছ। লো ব্লাড

কবিতা

গল্প থেকে ভূত উড়ে যায়

শ্যামলকান্তি দাশ

আজ যেখানে অট্টালিকা, কাল সেখানে মাঠ,
ছড়িয়ে আছে হাঁড়িপাতিল, চাটাই, চ্যালাকাঠ।

আজ যেখানে গঞ্জ, বাজার, ব্যবসাদারের গদি,
কাল সেখানে বইছে একা ঝিমকালোজল নদী।

আজ যেখানে লোকগিজগিজ, ছুটছে হাওয়াগাড়ি,
কাল সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছ্যাতলাধরা বাড়ি।

বাড়ির ভেতর মেঘ গুড়গুড়, বাদল ঝরে একা,
তারই মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেয় দেখা।

সেই আলোতে একটা ছায়া গড়গড়িয়ে যায়,
কেউ-বা মলয় পবন দিয়ে চোখ ঢাকে জানলায়।

নাচছে কবি, উড়ছে গায়ক, ভাবুক ভেসে আছে,
কেউ-বা দোলায় চরণ দুটি দোলনচাঁপা গাছে।

কেউ মাছ, কেউ মাছরাঙা, কেউ বউ-কথা-কও পাখি,
কেউ দোতারা, কেউ-বা শিঙা, কেউ ঢাক, কেউ ঢাকি।

গল্প থেকে ভূত উড়ে যায়, ঘুরতে থাকে মাথা,
বাঁচাও বাঁচাও, কোথায় আছ আমপাতা জামপাতা!

হাত ঝুমঝুম, পা ঝুমঝুম, ঝাপসা চারিদিক,
বরফগলা জলে কাঁপেন শিশুসাহিত্যিক!

ছবি : দেবাশিস দেব

প্রেশার। এতদূরে যাবে, সঙ্গে কেউ না গেলে হয় !"

ভূপতি বলল, "সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরব। বউমাদের বলো, আমার জামাকাপড় গুছিয়ে দিতে। আমাকে যেতেই হবে। বাধা দেবে না।"

মণিকা চেঁচামেচি শুরু করে দিল, বাড়িই তোমাকে খাবে। এই শুনছ, লিলি, লিপিকা শুনছ, তিনি কী বলছেন !"

ভূপতি কিছুই গ্রাহ্য করল না। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে। সে বাথরুমে ঢুকে গরম-ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নিল। হুকুম তামিল করার কাজ এখন বাড়ির লোকদের। গোছগাছ না করে দেয়, সে এক জামা কাপড়েই বের হয়ে যেতে পারে। ছেলেরা উপরে উঠে এল।

বড় ছেলে বলল, "তোমার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ কী ঢোকে বলো তো। যাবে ঠিক আছে। দু-দিন পরে যাও, দেখি আমরা কেউ সঙ্গে যেতে পারি কি না। ছুটিছাটার ব্যাপার আছে।"

বাথরুম থেকে বের হয়ে আয়নার সামনে চুল আচড়াল ভূপতি। মণিকা থম মেরে আছে।

"এ কেমন মানুষ রে বাবা। গোঁ ধরল তো ধরল। বাড়ির সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে না। আমার একটাও ক্যাজুয়াল পাওনা নেই। আমি না হয় সঙ্গে যেতে পারতাম। হঠাৎ বাড়ির জন্য এতটা উতলা হয়ে পড়লে, কেউ বাড়ির খোঁজ নেয় না। শুধু গাছ বিক্রি আর টাকা, এ ছাড়া তোমার মার চিঠিতে কী থাকে !"

ভূপতি তবু রওনা হয়ে গেল। ছোট ছেলে স্টেশনে তুলে দিয়ে এল। কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে দিল। হজমের, অম্বলের, আমাশয়ের বড়ি ভাগ-ভাগ করে সাজিয়ে দিল। মণিকা বলল, "সুনন্দাকে বলবে, যেন জল ফুটিয়ে দেয়। শিয়রে টর্চ নিয়ে শোবে। গ্রাম জায়গা, বর্ষাকাল, সাপখোপের উপদ্রবও কম নেই।"

ভূপতি চুপচাপ শুনল, কোনও কথা বলল না। তিন-চার বছর পর সে বাড়ি যাচ্ছে। এখনই জমির বন্দোবস্তনামা করে দিতে না পারলে বাড়ির শেষ গাছটিকেও রক্ষা করা যাবে না। অন্তত বাঁশের জঙ্গলটাও যদি সে পায়, বাবার শেষ গাছটি সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। দেরি করলে সেটাও যাবে। এবার সে আট হাজার টাকার কোপে পড়েছে। এই কোপ থেকেই শেষ পর্যন্ত মা অর্জুন গাছটি বিক্রি করে নৃপতির হাতে টাকা ধরিয়ে দিতে পারেন। যেন বিন্দুমাত্র দেরি করলে বাবা

বলতে পারেন, এই তুমি আমার লায়েক পুত্র ! তোমার ওপর এত আশা ছিল। মরে যেতে-না-যেতে যে জঙ্গল কিনেছিলাম, বাড়িটা সেই জঙ্গল হয়ে গেল। সাত-আট বছরে সব গাছ কেটে তোমরা সাফ করে দিচ্ছ। আমার কষ্ট হয় না !

কষ্ট তারও কম হয় না। কৈশোর, যৌবন, সেও এইসব গাছের ছায়ায় বড় হয়েছে। এক-একটা গাছ যেন বাবার এক-একজন সন্তান। গাছগুলির সঙ্গে বাবা একা থাকলে কথাও বলতেন। তারা যে-যার মতো উড়ে গেছে। এক নৃপতিই বাড়ি ছাড়া হয়নি। বাবার অমতে বিয়ে করে আলাদা ঘর তুলে আছে। শেষ বয়সে প্রায় তিনি সম্পর্কবিহীন হয়ে পড়েছিলেন। গাছগুলি ছিল বলে রক্ষা। গাছের কোথায় পোকা লেগেছে, পাতা ঝরে যাচ্ছে, লতাপাতায় গাছ জড়িয়ে গিয়ে দম ফেলতে পারছে না, কিছুই বাবার নজর এড়াত না। বর্ষার আগে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতেন, কলম করতেন, কলম বিলোতেন। যে নিয়ে যেত, তাকে বার বার বলতেন, "গাছের যত্ন করতে। যত্ন না করলে গাছ ফল দেয় না। ভাল না বাসলে গাছ নির্জীব হয়ে যায়।"

কখনও বাবা এক ক্রোশ দু'ক্রোশ পথ হেঁটে নিজেই চলে গেছেন। যে গাছ নিল, তার যদি গাফিলতি থাকে পরিচর্যায়— খোঁজ খবর না নিতে পারলে মনে শান্তি পেতেন না। বাড়ি ফিরলে মার চোট শুরু হয়ে যেত।

"তুমি মানুষ ! তোমার আক্কেল নেই। এতদূর হেঁটে গেলে গাছটি বেঁচে আছে না মরেছে, তোমার এত দায়।"

বাবা বলতেন, "গাছ তো নিজ হাতে একটাও লাগালে না। লাগালে বুঝতে পারতে।"

সারা রাস্তায় ভূপতি বসে-বসে ট্রেনে এসবই ভাবছিল। রাস্তায় ট্রেন অবরোধের মুখেও পড়ল। বেলা একটায় তার পৌঁছনোর কথা। সাঁঝ লেগে গেল। বৃষ্টি-বাদলার দিন। স্টেশন থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা। শরীরে জ্বর-জ্বর ভাবটা আছে। রিকশা না পেলে খুবই মুশকিল। রাস্তাঘাটও ভাল না। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা যেতে হয়। তারপরই কলোনির শুরু।

এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তিন-চার বছরে জায়গাটার পরিবর্তনও কম হয়নি। মেলা বাড়িঘর উঠেছে। জলের দরে যারা জমি কিনেছিল, তারা সবাই প্লট করে বিক্রি করে দিচ্ছে। আট-দশ হাজার টাকা দর। এখন আর কোথাও ঝোপ-জঙ্গল নেই বললেই চলে। সে তার নিজের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামতেই টের পেল, সামনের জমিটুকু ছাড়া বাকি জায়গা ঝোপ-জঙ্গলে ছেয়ে আছে। নৃপতির ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িতে কি কেউ নেই ! সে ডাকল, "নৃপতি আছিস !"

নৃপতির ছোট ছেলেটা দরজা খুলে বের হয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কোলাহল শুরু, "ঠাকুমা, জেঠু, উঠোনে দাঁড়িয়ে।" নৃপতি বোধ হয় ফেরেনি। বাড়িতে আরও লোকজন থাকার কথা। তারা গেল কোথায় !

নৃপতির উঠোনে বেশ জোরালো একটা আলো জ্বলছে। আলোতে সবই সে দেখতে পেল। সত্যি, ঝোপজঙ্গলের যেন শেষ নেই। বাবার ঘরটা পার হয়েই ঝোপজঙ্গলের শুরু। তার গলা পেয়ে মাও দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

রাত আটটাও বাজে না। গাঁয়ে এতটা নিশুতি রাত তো হওয়ার কথা না।

মা বারান্দায় চেয়ার বের করে দিতে

গেলে না বলে পারল না, "সুনন্দা কোথায় ?"

"মনোদের বাড়িতে টিভি দেখতে গেছে।"

"নৃপতির বউ কোথায় ?"

মা বললেন, "কী জানি কোথায়। সাঁঝ লাগলে কেউ কি আর বাড়ি থাকে রে বাবা। কখন রওনা হয়েছিস ? কী খাবি ?" বলেই রাস্তায় নেমে গেলেন সুনন্দার খোঁজে।

সব কিছু কেমন হতচ্ছাড়া মনে হচ্ছে তার। ছোট ছেলেটাকে ঘরে একা রেখে নৃপতির বউ, মেয়ে ঠিক টিভি দেখতে গেছে। মা একা-এক ঘরে। নৃপতির ছেলেটা একা এক ঘরে। দু'জনে মিলে বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে। সুনন্দা এসে বলল, "আপনি আসবেন জানব কী করে। কোনও খবরও তো দেননি।"

যাই হোক, খাওয়াদাওয়ার পর ভূপতি বলল, "নৃপতিকে ডাক।"

নৃপতি প্রায় ছুটেই এল। দাদার খুবই সে অনুগত। দাদা বাড়ি এলে তার কিছু বেশি আর্থিক সুবিধে হয় সে জানে। তাকে খুশিই দেখাচ্ছিল। হয়তো চালের কারবার শুরু করার একটা হিল্লে করতেই দাদা চলে এসেছে।

ভূপতি বারান্দায় বসে। নৃপতি পায়ের কাছে বসে। মা অদূরে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে আছেন।

"নৃপতি, কাল সবাইকে খবর দিবি। শ্রীপতিকে আসতে বলবি। বিপিন অমলকেও খবর দিবি। দাদাকে, আসার সময় স্টেশনে চিঠি রেখে এসেছি। রাতেই চিঠি পেয়ে যাবে। দাদা মনে হয় কাল বিকেলেই চলে আসবে। ভাবছি, জমির• ঝামেলা আর রাখব না। বন্টননামা করে দিয়ে যাব। বিপিন জমির আইনটাইন বোঝে ভাল। পূর্ণ আমিনকে ডেকে দু-তিন দিনের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলা দরকার।"

"সে না হয় খবর দিচ্ছি, কিন্তু দাদা,এত বড় জঙ্গল তো দু-চার দিনে সাফ করা যাবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠলে টের পাবি। ঘোর জঙ্গল হয়ে আছে বাবার গাছপালার জায়গাটা।"

"সব তো বুঝলাম নৃপতি, কিন্তু তোরা কত বড় অমানুষ বুঝতে পারছিস। গাছ কাটছিস, বেশ করছিস। গাছ কেটে পাশে কি আর একটা গাছ লাগানো যেত না ! আর কিছু না হোক, বাবা অন্তত খুশি হতেন। সাত-আট বছরে তাঁর গাছগুলো সাফ করে দিলি !"

"ওরে বাব্বা ! গাছ লাগাবে ! গাছ কাটলেই জায়গাটা দু- চার মাসে জঙ্গলে অগম্য হয়ে যায় ! সাধ্য কার ঢোকে। এজমালি জমি, অভাবি মানুষ আমি, জঙ্গল সাফ করব যে টাকা পাব কোথায় !"

সুনন্দাও বলল, "কাকা, তাজ্জব কাণ্ড। কাল দেখতে পাবেন। রাজ্যের আগাছায় সব জায়গা ভরে গেছে। গাছ কাটার পর দু-দিনও যায় না। জঙ্গলে ঢেকে যায় জায়গাটা।"

সকালে ঘুম থেকে উঠে ভূপতি এটা ভালভাবেই টের পেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় দেখল। বাঁশসমান উঁচু থরেথরে জঙ্গলের মাথা দেখা যায়। লতাগুল্মে ভর্তি। বর্ষাকাল বলে জঙ্গলটা খুবই সতেজ।

সে এগিয়ে গেল জঙ্গলটার কছে। এই জঙ্গলের মধ্যেই বাবার লাগানো গাছ না থাকলেও গুঁড়িগুলি আছে। সামনে কিছুটা যেতে পারলেই সে তার নিজের লাগানো গাছটির গুঁড়ি দেখতে পাবে। যেন কিছুটা ঘোরে পড়েই ঝোপজঙ্গলের ডালপালা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল।

নৃপতি চিৎকার করছে, "দাদা। যাস না।"

সুনন্দা চিৎকার করছে, "কাকা, যাবেন না। দুটো শ্বেত গোখরোর বাসা আছে ওদিকটায়।"

মা চিৎকার করছেন, "বাবা তোমার কত বড় অপদেবতা এবারে বোঝো। গোটা বাড়িটাকে জঙ্গল বানিয়ে মজা লুটছে।"

ভূপতি তবু চেষ্টা করছে ঢোকার। তার অপদেবতায় বিশ্বাস কম। সাপের উপদ্রব থাকতে পাবে। সতর্ক থাকলেই হবে।

ভূপতি জঙ্গলের ভেতর কিছুটা ঢুকেই ফাঁপড়ে পড়ে গেল। সারা গায়ে-মাথায় ডালপালা জড়াজড়ি করে তাকে যেন নিশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না। লতাপাতায় সে আটকা পড়ে যাচ্ছে। সে দু'হাতে যত লতাপাতা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তত সে আরও বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বলল, "বাবা, আমি তো কোনও দোষ করিনি।" কথাটা বলে সে যেন জোর পেল মনে। কোনওরকমে লতাপাতার জাল থেকে বের হয়ে হাঁপাতে লাগল।

সকালে দশ-বারোজন লোক নিয়ে এল নৃপতি। তারা জঙ্গল কাটতে শুরু করেছে। জ্বর গায়ে বারান্দায় বসে আছে ভূপতি। জঙ্গলের পাহাড় জমে উঠছে উঠোনে। জঙ্গলের পাহাড় দেখতে-দেখতে ভূপতির কেন যে মনে হল, গাছ কেটে তারা ভাল কাজ করেনি। বাড়িটাতে বাবার অশুভ নজর পড়েছে। না হলে, সুন্দর বাড়িটা এমন ছন্নছাড়া হয়ে যায় না।

জঙ্গল কিছুটা সাফ হতেই একটা কাটা গাছের গুঁড়ি দেখা গেল। ভূপতি অবাক। গুঁড়ির পাশে সজীব একটি আম গাছ বড় হয়ে উঠছে। লতাপাতায় ঢাকা ছিল। জঙ্গল সাফ হওয়ায় গাছটা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এভাবে জঙ্গল যত সাফ হতে লাগল ভূপতি নৃপতি তত ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। যেখানে যে গাছটি কাটা হয়েছে, তার পাশেই আর-একটি সেই গাছ, কাঁঠাল হলে কাঁঠাল গাছ, আম, জাম, জামরুল, আমলকী হলে আম, জাম, জামরুল; আমলকী গাছ। বছর অনুযায়ী তারা বেড়ে উঠেছে জঙ্গলে।

"গাছ কে লাগাল ?" ভূপতি না বলে পারল না।

শ্রীপতি বলল, "গাছ তো দাদা বীজ থেকে হয়।"

ভূপতি কেমন কিছুটা ঘোরে পড়ে গেছে। বলল, "বাজে কথা। জঙ্গল হলে বীজ পচে যায়। গাছের চারা মরে যায়। সব গাছ বীজ থেকে হয়ও না। গাছগুলো সব সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ করেছিস। কোনও নিপুণ কারিগরের কাজ মনে হয় না ?"

"হয়।" শ্রীপতি ঢোক গিলে বলল।

নৃপতি বলল, "আমি সত্যি জানি না দাদা। আমি লাগাইনি। মরণের সময় পাই না, গাছ লাগাব !"

ভূপতির এক কথা, "গাছ কেউ না লাগালে এ-ভাবে বড় হয় !"

শ্রীপতি বলল, "লতাপাতায় গাছগুলি ছেয়েছিল বলে বোঝাই যায়নি, জঙ্গলে গাছ বড় হচ্ছে।"

সুনন্দা কেমন ভয় পেয়ে গেছে। "আমি সত্যি জানি না কাকা। আমি লাগাইনি। এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড কাকা।"

মা'র চোপা শুরু, "তোমরা বুঝছ না কার কাজ ! তোমার বাবা ছাড়া এমন দুর্মতি কার হবে ! তিনি ছাড়া কে গাছ লাগাবেন ! সারা জীবন জ্বালিয়েছেন। মরে গিয়েও বাড়ি ছাড়ছেন না। তিনি এখন আবার গাছ লাগাতে শুরু করেছেন। কত বড় অপদেবতাকে নিয়ে ঘর করেছি, নিজের চোখে দেখে বোঝো !"

ভূপতি বারান্দায় ফিরে এসে সবাইকে বলল, "আপাতত বন্টননামা আর হচ্ছে না। বাবার গাছগুলিকে বড় হতে দাও। দেখি পরে কী করা যায়। ভূপতি সেদিন রাতেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেল।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ভূতের গল্প

শিমুলতলার মাধবী লজ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

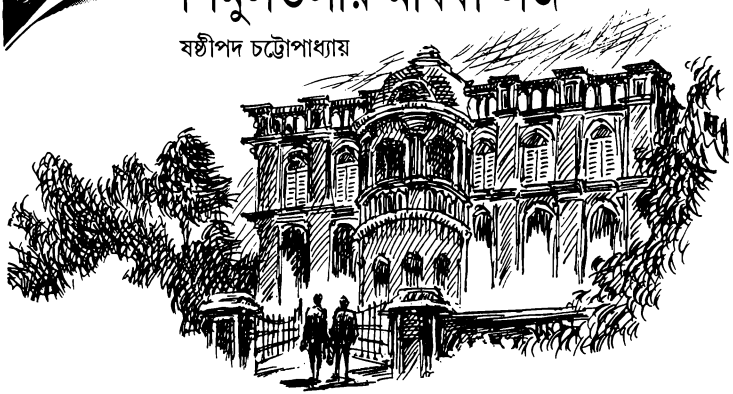

সে-বছর ঘনঘন নিম্নচাপের ফলে বর্ষাকালটায় মানুষ প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । একে তো বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছেই, তার ওপর যেদিনই একটু ধরনের মতো হয় সেদিনই রেডিয়ো আর খবরের কাগজ ঘোষণা করে ভয়ঙ্কর এক নিম্নচাপের কথা ।

যাই হোক, সারাটা বর্ষা এইভাবে কাটবার পর শরৎ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাবলাম, এবার বুঝি দুর্যোগ কাটল । এক সুন্দর সকালে হঠাৎ দেখি আঙিনায় শিউলি ছড়িয়ে আছে । মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে পুজো-পুজো গন্ধ । আনন্দে নেচে উঠল মনটা । ভাবলাম আর ঘরে বসে থাকা নয়, দু-চার দিনের জন্য বরং চট করে কোথাও থেকে ঘুরে আসা যাক । কিন্তু যাব কোথায় ? চা খেতে-খেতে 'টাইম টেব্‌ল'-এর পাতা ওলটাতে লাগলাম । হঠাৎ চোখে পড়ল নতুন একটি সাপ্তাহিক 'নর্থ বিহার এক্সপ্রেস' চালু হয়েছে । ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় ছাড়ে । শিমুলতলা পৌঁছয় সকাল ছ'টায় । ভাবলাম, অনেক জায়গায় তো গেছি, কিন্তু শিমুলতলায় কখনও যাইনি । অতএব শিমুলতলা থেকেই ঘুরে আসি না কেন ?

এই মনে করে পাজামা আর পাঞ্জাবিটা পরে যখন বেরোতে যাচ্ছি ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে সুজয় এসে হাজির হল । সুজয় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু । বলল, "কী ব্যাপার রে ! এমন অসময়ে চললি কোথায় ? ক'দিন পর একটু হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম তোর বাড়ি এসে চুটিয়ে আড্ডা দেব, তা তুই-ই শেষকালে কেটে পড়ছিস ?"

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম । বললাম, "ভাগ্য ভাল যে, বেরিয়ে পড়িনি । আমি এই বিরক্তিকর আবহাওয়ায় বড্ড বেশি বোর বোধ করছিলাম নিজেকে । তাই দু-চারদিনের জন্য এই একঘেয়েমির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছিলাম । সেইজন্যই হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছিলাম আজ রাতের গাড়িতে একটা বার্থ রিজার্ভেশনের ধান্দায় ।"

"যাবি কোথায় ?"

"শিমুলতলায় । তুই যাবি ?'

"এত তাড়াতাড়ি কী করে যাব ? কোনও প্রস্তুতি নেই, কিছু নেই, একেবারে আজই ?"

"আরে, এ তো কাশ্মির কিংবা সিমলা নয়, শিমুলতলা । এর আবার প্রস্তুতির কী আছে ? তোর কিট ব্যাগে শুধু জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নিবি । খরচখরচা আমার ।"

সুজয় উৎসাহিত হয়ে বলল, "তা হলে আমি রাজি ।"

মনের মতো একজন সঙ্গী পেয়ে আনন্দে ভরে উঠল মন । দু'জনে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রাতের গাড়িতে রিজার্ভেশনও করিয়ে আনলাম । রাত এগারোটায় ট্রেন । সুজয়ের সঙ্গে কথা হল ও ন'টার মধ্যেই চলে আসবে আমার কাছে । তারপর আমরা একসঙ্গেই রওনা দেব ।

যাই হোক, বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়ার পর সারাটি দুপুর ধরে গোছগাছ করতে লাগলাম । আসলে এই বর্ষায় অথবা বর্ষার পরে পাহাড়ি অঞ্চলগুলো আমার খুব ভাল লাগে । কেননা বৃষ্টিস্নাত গাছপালা থেকে একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ বেরোয় । ভিজে মাটি থেকে চমৎকার একটা মেঠো সুবাস পাওয়া যায় । তাই নতুন দেশে যাওয়ার উল্লাসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর নিয়ে পরিপাটি করে সুটকেসটি গুছিয়ে ফেললাম ।

কিন্তু এত আনন্দ, এত গোছগাছের মধ্যেও হঠাৎ একসময় দেখি আকাশ কালো করে কী ভয়ানক মেঘ উঠেছে । আবার কি নিম্নচাপ ? কে জানে ? খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম । একদিকে ভাদ্রের চড়া রোদ, অন্যদিকে আকাশের ঈশানে মহাপ্রলয়ের সূচনা । দেখতে-দেখতে সেই মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ল । তারপর খুব ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে । তারও পরে শুরু হল প্রবল বর্ষণ । কিছুসময়ের মধ্যেই রাস্তায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেল । অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ডুবে গেল সব । সন্ধের মুখে বেগ একটু কমলেও বৃষ্টিপাত সমানে চলতে লাগল । আমার বাড়ি থেকে সুজয়ের বাড়ি অন্তত আধ ঘণ্টার

পথ। এই দুর্যোগে সে কিছুতেই আসতে পারবে না। আমিই যা যাব কী করে? তাই যাওয়ার আশা ত্যাগ করে ঘরে বসে গল্পের বই পড়তে লাগলাম।

এদিকে রাত ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি সুজয়। কালো একটা বর্ষাতি পরে কিট ব্যাগ কাঁধে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "এই দুর্যোগে কী করে এলি তুই?"

"না এলে তুই কী ভাবতিস বল?"

"কী আর ভাবতাম? এত দুর্যোগে মানুষ বেরোতে পারে? যাক, এসে ভালই করেছিস। রাস্তায় এখন জল কীরকম?"

"কোনওরকমে যাওয়া যাবে।"

"তা হলে আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়ি চল।"

আমি তৈরিই ছিলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে এসেই একটা টানা রিকশা ধরে সোজা হাওড়া স্টেশনে। আমাদের ট্রেনও তখন প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে।

প্রতিদিনের দেখা সেই হাওড়া স্টেশনের আজ একেবারেই অন্যরকম চেহারা। খাঁ-খাঁ করছে স্টেশন চত্বর। মাঝেমধ্যে একটি দুটি যাত্রীবিহীন লোকাল ট্রেন আসছে। দূরপাল্লার গাড়িগুলো সবই প্রায় ফাঁকা। বহুলোক এই দুর্যোগে আসতেই পারেনি। আমরা যাওয়ার পরই দেখলাম একজন রেলকর্মচারী রিজার্ভেশন চার্ট হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিল। কিন্তু চার্টের দিকে তাকিয়েই চক্ষুস্থির। এ তো বৃষ্টির জন্য নয়। দেখলাম এতবড় গাড়িটার একটি বগিতে মাত্র আমাদের দু'জনের নাম আছে। আর একটিতে আছে পাঁচজনের। বাদ বাকি সবই সাদা। ইংরেজিতে 'নিল' লেখা আছে।

সুজয় বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "ট্রেনটা আসলে নতুন তো। সবে চালু হয়েছে। অনেকেই জানে না। তাই এই অবস্থা। তা ছাড়া ভিড় হয় না বলে এই গাড়িতে সচরাচর কেউ রিজার্ভেশনও করায় না। বিনা রিজার্ভেশনেই এই গাড়িতে সারারাত শুয়ে যাওয়া যায়।"

কী আর করি? আমরা দু'জনে ভয়ে-ভয়েই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বগিতে ঢুকে বসলাম। সত্যি বলতে কী, এত বড় বগিতে আমরা দু'জন এ যেন ভাবাই যায় না। সুজয় না এলে আমি তো আসতামই না। এলেও যাত্রা বাতিল করতাম।

বৃষ্টির বেগ হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। ট্রেন ছাড়বার সিগন্যালও হয়েছে। এমন সময় দু'জন আর. পি. এফ. এসে বললেন, "এই বগিতে কি আপনারা দু'জন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এক কাজ করুন, পাশের বগিতে পাঁচজন আছেন। আপনারা সেখানে চলে যান। সাধারণ যাত্রীদেরও আমরা ওই বগিতে ঢুকিয়ে নিয়েছি। সেখানে পুলিশ গার্ড থাকবে। প্রত্যেক বগি থেকেই আমরা লোকজন সরিয়ে আনছি।"

আমি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী করবি রে?"

"যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। সিগন্যাল হয়ে গেছে। ট্রেন এখনই ছাড়বে।" বলেই ওঁরা নেমে গেলেন।

এই নিষেধাজ্ঞার পর আর থাকা উচিত নয় ভেবে আমরা পাশের বগিতে যাওয়ার জন্য তৎপর হলাম। সুজয় অবশ্য যাওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু আমরা গেটের কাছে যেতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমি তবুও নামতে যাচ্ছিলাম। সুজয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল, "করছিস কী! এখন কখনও রিস্ক নেয়? সেরকম বুঝলে বর্ধমানে নেমে বগি বদল করে নেব।"

সেই ভাল। আমরা দরজায় লক এঁটে ভেতরে এলাম। রাত এগারোটার ট্রেন। সামনে কোনও বাধা নেই। লাইন ক্লিয়ার। তাই ছেড়েই গতি নিল ট্রেন। বৃষ্টিও গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে ঝরে চলেছে। জানলার কাচ নামানো সত্ত্বেও বাইরের ঝাপটা ভেতরে ঢুকছে।

সুজয় বলল, "একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ বল?"

"তা হলে আর কোথাও নামা-ওঠার দরকার হবে না। এই বগিটার চারদিকের দরজা ভেতর থেকে লক করে এর মধ্যে যে লেডিজ কুপটা আছে আমরা দু'জনে সেইখানে শুয়ে থাকলে কেমন হয়? তা হলে আর এত বড় বগিটার শূন্যতা চোখ মেলে দেখতে হবে না। কোনওরকমে দু' চোখ এক করে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে এক ঘুমে সকাল হয়ে যাবে।"

"চমৎকার আইডিয়া।" বলেই চারদিকের গেটে ছিটকিনি এঁটে কুপের ভেতরেও লক করে দিলাম। এইবার সারারাতের মধ্যে গেট খুলে কাউকেই আর ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি না।

রাত অনেক হয়েছে। সঙ্গের খাবার খেয়ে শেষবারের মতো একবার টয়লেটে গেলাম মুখ-হাত ধুয়ে একটু হালকা হয়ে আসতে। কিন্তু টয়লেটের ভেতরে ঢোকামাত্রই কেমন যেন 'ম-ম' করা একটা মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সেইসঙ্গে হঠাৎ এক নিদারুণ ভয়ে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। সে কী দারুণ ভয়। ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবুও ভয়। তাই চট করে বেরিয়ে এলাম।

আমার হয়ে গেলে সুজয় ঢুকল। ও-ও বেরিয়ে এসে বলল, "ভারী চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ, তাই না?"

আমি অতিকষ্টে বললাম "হ্যাঁ।"

"তুই খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে?"

"কই, না তো!"

"তোর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে।" তারপর একটু হেসে বলল, "আসলে আমার মনে হয় কোনও ব্যাপারি এই বগিতে করে নিশ্চয়ই গোলাপের ঝাঁকা নিয়ে যাচ্ছিল।"

"তা হবে।"

"ঠিক আছে। তোর যদি ভয় করে, আর এদিকে না এলেই হল। এখন আমরা চুপচাপ শুয়ে পড়ি চল। এতবড় বগিতে আমরা মাত্র দু'জন। ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।"

আমরা আর দেরি না করে কুপের মধ্যে দু'জনে দুটো মিড্‌ল বার্থ দখল করে শুয়ে পড়লাম। মিড্‌ল বার্থ নিলাম তার কারণ লোয়ার বার্থে বাইরের জলের ঝাপটা কাচের জানলার বাধা টপকে ভেতরে গড়াচ্ছে। আপার বার্থে ছাদের জল কাঠের ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। মাঝের বার্থে সে ঝামেলা নেই।

শোওয়ামাত্রই ঘুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমরা।

রাত তখন কত কে জানে! বাইরে প্রবল বর্ষণ। ট্রেন দুর্গাপুরে থেমেছে। বেশিক্ষণ নয়। মিনিট-পাঁচেক থামার পরই ছেড়ে দিল ট্রেন। এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কে যেন ছুটে এসে ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপরই দমাদ্দম ধাক্কা দরজায়।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। সুজয় হাত চেপে ধরল আমার। বলল, "একদম খুলবি না। যেই হোক। মরুক ব্যাটা।"

আবার শব্দ। এবার মেয়েলি গলায় করুণ কণ্ঠে অনুরোধ, "ভেতরে কে আছেন? দয়া করে দরজাটা খুলুন। না হলে আমি পড়ে যাব।"

আমি বললাম, "সুজয়, প্লিজ।"

"না। মরুক ও। এইভাবে ওঠে কেন?"

এবার রীতিমত রেগে গেলাম আমি। বললাম, "এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করিস না। একটি অসহায় মেয়ে এই দুর্যোগে চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলবে আর, আমরা স্বার্থপরের মতো শুয়ে-শুয়ে ঘুমোব-এ হয় না।"

"কার মনে কী আছে জানিস তুই ?"

"এটা জানাজানির ব্যাপার নয়, এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।"

ওদিক থেকে তখন কাতর প্রার্থনা আবার শুরু হয়েছে, "প্লিজ, একবার দরজাটা খুলুন। দোহাই আপনাদের। আমি আর ঝুলতে পারছি না। আমার এক হাতে ভারী সুটকেস। আমি এখনই হাত ফসকে পড়ে যাব। আপনারা কি চান আমি মরি ?"

এই কথার পর আর আমি থাকতে পারলাম না। সুজয়ের আপত্তি না শুনে নিজেই গিয়ে দরজার লক খুলে ঢুকিয়ে নিলাম মেয়েটিকে।

অষ্টাদশী তরুণী। অপূর্ব মুখশ্রীর তুলনা মেলা ভার। গায়ের রং চাঁপার মতো ফরসা। বৃষ্টিতে ভিজে সপসপ করছে বেচারি। ভেতরে ঢুকে সুটকেসটি নামিয়ে রেখে বলল, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে।"

আমি বললাম, "এইভাবে চলন্ত গাড়িতে কেউ ওঠে ?" বলেই দরজাটায় আবার ছিটকিনি এঁটে দিলাম।

মেয়েটির দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, "একী ! আবার লক করছেন দরজায় ? খুলুন, খুলে দিন বলছি। এইভাবে দরজা বন্ধ করে ভেতরে শুয়ে থাকলে রাতদুপুরে লোকজন ওঠা-নামা করবে কী করে ?"

আমি বললাম, "এই দুর্যোগের রাতে লোকজন কোথায় ? তা ছাড়া এই বগিতেও আমরা মাত্র দু'জন। আপনাকে নিয়ে তিন।"

"সে আপনারা দু'জনই থাকুন আর একজনই থাকুন, দরজায় লক করা কখনওই উচিত নয়। দেখুন তো, কত কষ্ট পেলাম আপনাদের জন্য।"

সুজয়ও তখন কুপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বলল, "খুব তো জ্ঞান দিচ্ছেন, লাইনের অবস্থা জানেন ? এই উদরতার সুযোগে কোনও বদলোক গাড়িতে উঠে যদি রিভলভার দেখায়, তখন কী হবে ?"

বৃষ্টিভেজা মেয়েটি তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। সুজয়ের কথায় একটু নরম হয়ে বলল, "কিছু মনে করবেন না, আমি অবশ্য বিপদের ওই দিকটা চিন্তা করিনি।"

সুজয় বলল, "কাউকে কিছু বলার আগে অনেক কিছুই চিন্তা করবেন। আসুন, ভেতরে আসুন।"

মেয়েটির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘুমের দফাও শেষ হয়ে গেল। সে কুপের মধ্যে ঢুকেই তার সুটকেসটি আপার বার্থে রেখে নিজে লোয়ার বার্থে কষ্ট করে বসে রইল।

আমি বললাম, "আপনি এক কাজ করুন, আমরা বাইরে যাচ্ছি। আপনি ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে ফেলুন। না হলে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে আপনার শরীর খারাপ করবে।"

মেয়েটি বলল, "কিছু হবে না আমার।"

এমন সময় হঠাৎ গাড়ির আলো নিভে গেল।

আমি বললাম, "আমার কথা শুনুন। শাড়িটা বদলে নিন। না হলে নিজেই কষ্ট পাবেন।"

"বেশ, যখন আপনি এত করে বলছেন তখন তাই হোক।" বলেই সুটকেস নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

আবার আলো জ্বলে উঠল। মেয়েটি কুপের বাইরে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে হাসিমুখে আবার এল ভেতরে।

আমি ওর বসবার সুবিধের জন্য মিড্‌ল বার্থটা নামিয়ে দিলাম। সুজয় তখন ওপাশের বার্থে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মেয়েটিকে বললাম, "আপনি চাইলে আমরা কিন্তু কুপের বাইরে যেতে পারি।"

"কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া আমাকে কাছাকাছিই নেমে যেতে হবে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো মুশকিল হয়ে যাবে।"

"এইটুকু পথ যাওয়ার জন্য আপনি রাতের গাড়ি ধরলেন কেন ? তায় এইভাবে একা !"

মেয়েটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আমার কথা থাক। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন বলুন ?"

"আমরা শিমুলতলা যাচ্ছি।"

"কেউ আছে বুঝি সেখানে ?"

"উঁহু। কেউ নেই, এমনই বেড়াতে যাচ্ছি।"

"কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন ?"

"আমাদের এক বন্ধু বলে দিয়েছেন রানিকুঠিতে উঠতে।"

"ওখানে যদি জায়গা না পান ?"

"তা হলে অন্য কোথাও উঠব।"

"আপনারা মাধবী লজে উঠবেন।"

"আপনি কখনও উঠেছিলেন ওই লজে ?"

"না, না। ওখানে মানে শিমুলতলায় আমার মেজ মাসি থাকেন। আমি প্রায়ই যাই। খুব ভাল জায়গা। আমার তো গেলে আসতে ইচ্ছে করে না।"

"তা হলে চলুন না আমাদের সঙ্গে ? আপনি থাকলে খুব ভাল হবে। আপনার সাহায্য নিয়ে চারদিক বেশ ভালভাবে ঘুরে দেখে নিতে পারব। আপনিও এই সুযোগে আর-একবার আপনার মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারবেন।"

মেয়েটি বলল, "যেতে খুবই ইচ্ছে করছে। তবে এখন আমার যাওয়ার কোনও উপায় নেই।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা দামি জিনিস দেব, সেটা দয়া করে আমার মাসির বাড়িতে পৌঁছে দেবেন ?"

"নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনি বিশ্বাস করে দামি জিনিসটা আমাদের হাতে দেবেন ? ধরুন, যদি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি ?"

মেয়েটি হাসল। বলল, "তা আপনারা করবেন না। আমি মানুষ চিনি।"

"বেশ দেবেন। কিন্তু সেই দামি জিনিসটা কী ?"

"যখন দেব তখনই দেখতে পাবেন। আমার যাওয়ার উপায় থাকলে আমিই গিয়ে দিয়ে আসতাম।"

"উপায় নেই কেন ?"

"কী হবে জেনে ? আপনি বড় সেন্টিমেন্টাল। শুনে আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনার ওই বন্ধুটি তো দরজাই খুলতে দিচ্ছিলেন না আপনাকে। আপনি জোর করে খুলে দিলেন, তাই। সত্যি, সবাই যদি আপনার মতো হত।"

"আমার বন্ধুটি দরজা খুলতে দিচ্ছিলেন না সে-কথা আপনি কী করে জানলেন ?"

মেয়েটি হেসে বলল, "আমি সব জানতে পারি।"

"তা জানুন। কিন্তু আমিও আপনার সব কথা জানতে চাই।"

মেয়েটি ম্লান মুখে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "শুনবেন ?" বলেই উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"একবার টয়লেট থেকে আসি, এসে বলছি।"

মেয়েটি দরজার লক খুলে টয়লেটের দিকে গেল। ও বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কুপের ভেতরটা সেই ঝাঁঝালো গোলাপি গন্ধে ভরে উঠল। সেই সঙ্গে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল কামরার মধ্যে।

অমনই শোনা গেল গেটের পাল্লার দড়াম-দড়াম শব্দ। সর্বনাশ, মেয়েটি লকগুলো খুলে দিয়েছে নাকি ?

সুজয় তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। আমি ওকে ডেকে তুললাম। বললাম, "তোর কথা না শুনে খুব ভুল করেছি রে ভাই। মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনও দুষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত। টয়লেটে যাওয়ার নাম করে দরজার লকগুলো খুলে দিয়েছে। পরের স্টেশনে নির্ঘাত ডাকাত পড়বে।"

সুজয় লাফিয়ে নামল বার্থ থেকে, "বলিস কী রে !"

"হ্যাঁ। ওই দ্যাখ দরজাটা খোলা।"

সুজয় রেগে বলল, "দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। আমার সঙ্গে চালাকি ? আমি জানতুম বলেই বারণ করেছিলাম। কই, চল তো দেখি কোথায় গেল ?"

"টয়লেটে গেছে। কিন্তু আমাদের এই কুপের ভেতরটা কেমন ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে দেখেছিস ?"

"ভরে ওঠাচ্ছি।" বলে এগিয়ে গেল টয়লেটের দিকে।

আমিও গেলাম ওর সঙ্গে। প্রথমেই গেটের পাল্লা দুটো লক করে দিলাম। কিন্তু দিলে কী হবে ? সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে আপনা থেকেই খুলে গেল পাল্লা দুটো। একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যেন।

সুজয়ের কিন্তু এসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে সোজা এগিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। মুখোমুখি দুটি দরজারই একই অবস্থা। কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায় ? তাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন ?

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আমি। সুজয়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আসানসোলে গাড়ি থামলে বগি বদল করলাম। মেয়েটির সুটকেস তেমনই পড়ে রইল কুপের ভেতর। ওতে আমরা হাতও দিলাম না।

সে রাতটা প্রায় জেগেই কাটালাম। পরদিন খুব ভোরে ট্রেন এসে শিমুলতলায় থামলে নেমে পড়লাম আমরা।

শিমুলতলার আকাশে কোনও মেঘ নেই। শিমুলতলার প্রকৃতি ভোরের আলোয় অপরূপ। আমরা স্টেশনে নেমে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে রানিকুঠির দিকে চললাম। স্টেশনের বাঁ দিক দিয়ে যে পথটি লীলাবরণ ঝরনার দিকে চলে গেছে সেই পথ ধরেই গেলাম আমরা। থানার পাশ দিয়ে অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর দূরের ঝাঁঝার পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারপর লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথে দু-একটি দিঘিসরোবর পার হতেই চোখে পড়ল মাধবী লজ। আমরা মাধবী লজ ছেড়ে রানিকুঠিতে এলাম। কিন্তু বিধি বাম। এখন সিজন-টাইম নয় বলে রানিকুঠির অধিকাংশ ঘরই মালগুদামে পরিণত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই মাধবী লজে উঠতে হল।

মাধবী লজের দরোয়ান কেয়ারটেকার যাই বলো না কেন, সবই ওই গফুর। বেশ লম্বা-চওড়া লোকটি। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। ব্যবহার ভদ্র। আমরা যেতেই খুব আগ্রহের সঙ্গে একটি ঘর খুলে দিল আমাদের। খুব যে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর তা নয়। তবে বেশ বড়সড়। বাথরুম লাগোয়া। কল আছে কিন্তু জল নেই। বাইরে একটা ইঁদারা আছে। সেখান থেকে জল এনে ভরতে হবে। এই ঘরের লাগোয়া আর-একটি ঘর আছে। সেটি আকারে ছোট। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আমরা বললাম, "এই ঘরটাই আমাদের দাও না গফুর। দু'জন তো আমরা। ছোট ঘরই আমাদের পক্ষে ভাল।"

গফুর বলল, "না বাবু, ও ঘর ভাড়া হয়ে গেছে। একজনের আসবার কথা, না হলে ওটাই আপনাদের দিতাম।"

দুটি ঘরের মাঝখানে দরজা। দরজার শিকলটা আমাদের দিকে। গফুর দরজায় শিকল তুলে দিল। বলল, "এই দরজা একদম খুলবেন না বাবু। ও ঘরেও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"ওরা তা হলে যাতায়াত করবে কোথা দিয়ে ?"

"ওদিকে আর-একটা দরজা আছে। সে দরজায় তালা দেওয়া। চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না তাই। না হলে ও ঘরে গিয়ে এই দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিতাম।"

আমি বললাম, "গফুর, ওই ঘরটাই আমাদের চাই। ওরা এলে তুমি বরং ওদেরকেই এই ঘরে পাঠিয়ে দিয়ো।"

"অ্যায়সা কভি নেহি হো সকতা। ওঁরা আমাদের পুরানা আদমি। হর বখত আসেন। তাই ওই ঘরটাই পছন্দ করেন। আড়ভাঙ্গ রুপিয়া ভি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ডবল ভাড়া দিলেও ও ঘর আপনাদের আমি দেব না।"

"বেশ, তোমার অসুবিধে থাকে দিয়ো না। আমরা বরং অন্য কোথাও চলে যাই।"

"যো আপকো মর্জি। তবে এই ঘর ছাড়লে কিন্তু ভুল করবেন।"

"কেন, এখানে কি আর কোথাও ঘর খালি নেই ?"

"নেহি। এইসময় এখানে কোনও লোক আসে না।"

"কিন্তু তোমার এখানে বাথরুমে তো জলাভাব।"

"সেজন্য আমি আছি। আমি ইঁদারা থেকে পানি তুলে এনে দেব আপনাদের। যাওয়ার সময় দু-পাঁচ টাকা বখশিশ দিয়ে দিবেন।"

আমরা আর কী করি, মাধবী লজেই রয়ে গেলাম।

ঘরে জিনিসপত্র রেখে দরজায় তালা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম শিমুলতলার পথে পথে। চারদিকে ভিজে লাল মাটি আর সবুজের সমারোহ। এখনও এত গাছপালার ঘনত্ব খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। পায়ে-পায়ে আমরা লাটু পাহাড়ের দিকে এগোলাম। জায়গাটা বেশ নির্জন এবং এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ চমৎকার। আমরা অনেকক্ষণ ধরে লাটু পাহাড়ে বেড়িয়ে আবার যখন ঘরে ফিরলাম তখন চড়া রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁঝাঁ করছে। আমরা এসে ইঁদারার জলে স্নান করে মোড়ের মাথায় গিয়ে একটা দোকানে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

এ-ঘরে পাশাপাশি দুটো খাট পাতা। একটাতে আমি, অন্যটিতে সুজয়। শুয়ে-শুয়ে আমরা গতরাতের সেই রহস্যময়ীর ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলাম।

সুজয় অবশ্য একটু গম্ভীর। কাল রাত থেকেই ও যেন কীরকম হয়ে গেছে।

আমি বললাম, "মেয়েটার ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিই বল তো ? ওইভাবে দুমদাম দরজা খুলে যাওয়া, টয়লেট থেকে অদৃশ্য হওয়া আর ওই গোলাপ ফুলের গন্ধ, এর থেকে আমরা কী ধারণা করতে পারি ?"

সুজয় গম্ভীর স্বরেই বলল, "যা করবার। অর্থাৎ কিনা আমরা ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভূত ছাড়া কিছুই নয়, ওটা একটা প্রেতিনি।"

"ভাগ্যে বুদ্ধি করে কামরাটা বদল করেছিলাম, না হলে কী যে হত। তবে মেয়েটি খুবই ভাল, ভূত-প্রেতিনি যেই হোক না কেন, আমাদের সঙ্গে কিন্তু কোনওরকম দুর্ব্যবহার করেনি।"

"করেনি বললেই হল ? ওইভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, দুমদাম করে দরজা খুলে দেওয়া, এগুলো বুঝি ভদ্র ব্যবহারের নমুনা ?"

"তা হয়তো নয়, তবে আমার মনে হয় ওইসবের মধ্য দিয়ে ও নিশ্চয়ই ওর অস্তিত্বের

অলৌকিকত্বটা বোঝাতে চেয়েছিল। ওর মনে কোনও বদ মতলব থাকলে ও নিশ্চয়ই অন্য কোনওভাবে ভয় দেখাত আমাদের।"

এইভাবে কথা বলতে-বলতে দুপুর গড়িয়ে দিলাম আমরা। বিকেলে আবার বেড়াতে বেরিয়ে দূরের ঝাঁঝার পাহাড়গুলো দেখতে-দেখতে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা সেই নির্জন প্রকৃতির লীলাভূমিতে বিচরণ করে আবার যখন মাধবী লজে ফিরে এলাম, তখন দেখি, না আমাদের পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। খুটখাট শব্দও শোনা যাচ্ছে। তার মানে যাদের আসবার কথা ছিল তারা এসে গেছে।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একবার ভাবলাম আমাদের এদিকে দরজায় শিকল তো দেওয়া আছে, ঝনঝন করে নাড়া দিয়ে ওদের ডাকি এবং দু' ঘরের দরজা খোলা রেখে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি। আবার ভাবলাম কী দরকার। যদি ওঁরা অন্য কিছু মনে করেন। তাই মনে-মনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজেদের মধ্যেই নানা বিষয়ের আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সুজয় বলল, "এই সময় গফুরটাকে পাওয়া গেলে খুব ভাল হত।"

"ও থাকলে কী করত?"

"ওকেই বলতাম ওদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে।"

"ঠিক বলেছিস। ডাকব গফুরকে?"

"ডাক।"

আমি বাগানে এসে অনেক হাঁকডাক করলাম। কিন্তু কোথায় গফুর? তার কোনও সাড়াশব্দও পেলাম না। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। কী নিদারুণ, অন্ধকার চারদিকে। পাশের ঘর থেকে স্ত্রীলোকের গলার খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল।

সুজয় বলল, "এই সুযোগ। এইবার বরং শিকল নেড়ে ওদের ডাকা যেতে পারে।"

"সেটা কিন্তু আরও খারাপ হবে।"

"খারাপ হবে কেন? আমরা চালাকি করে একটা দেশলাই চাইব। অন্ধকারে যে কেউ যাকে ইচ্ছা দেশলাই চাইতে পারে। তা ছাড়া সত্যিই তো আমাদের কোনও বদ মতলব নেই। শুধু এই প্রেতপুরীর মতো ভয়ানক নির্জনতায় একটু মানুষের সান্নিধ্য চাই।" এই বলে সুজয় এগিয়ে গিয়ে দরজার শিকল খুলে একবার ঝনঝন শব্দ করল। মুখে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন তো দরজাটা খুলবেন একবার?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে গেল।

সেই সঙ্গে গত-রাতে ট্রেনের মধ্যে যে মিষ্টি গোলাপের গন্ধটা পেয়েছিলাম, সেই গন্ধে ভরে উঠল ঘর। আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে তখন। হবে নাই বা কেন? এই মিষ্টি গন্ধের সঙ্গেই তো সেই অশুভ আবির্ভাব হয়। তবে? তবে কি আবার আমরা সেই প্রেতিনির পাল্লায় পড়লাম? কিন্তু না, এই অন্ধকার ঘরে কেউ কোথাও নেই।

সুজয় বলল, "এ ঘরে কে আছেন? অনুগ্রহ করে একটা দেশলাই ধার দেবেন আমাদের?"

আমি ভয়ার্ত গলায় বললাম, "এ-ঘরে কেউ নেই সুজয়, চলে আয়।"

ও তবুও ঘরে ঢুকল। আর ঢোকামাত্রই সেই অন্ধকারে একটি হাত এগিয়ে এল, "এই নিন দেশলাই।"

বলা বাহুল্য, সে হাত একটি মেয়ের। সুজয় তার থেকে দেশলাইটা নিতে যেতেই হোহো করে হেসে উঠল সে।

আমি সভয়ে পিছিয়ে এলাম।

এইবার একটু-একটু করে অন্ধকারে তার ছায়াশরীর স্পষ্ট হল। তাকে দেখেই চমকে উঠলাম। এ আর কেউ নয়, কাল রাতের সেই রহস্যময়ী!

আমি তখন এক লাফে বাইরে এসেই একেবারে রাস্তার মোড়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, "গফুর, গফুর!"

আমার চিৎকার শুনে মোড়ের মাথা থেকে গফুর এবং আরও কয়েকজন ছুটে এল, "কী হল বাবুজি? মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। তোমরা সবাই এসো, গিয়ে দেখবে চলো কী অঘটন ঘটে গেছে।"

"কী হয়েছে?"

"গেলেই দেখতে পাবে। দেরি কোরো না, তা হলে আমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারব না।"

এই কথায় সবাই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর গফুরের ডাকে অন্তত জনাদশেক লোক ছুটে এল হইহই করে।

গফুর বলল, "আমি বারবার মানা করেছিলাম পাশের ঘরের দরজা খুলতে। নিশ্চয়ই খুলেছিলেন আপনারা?"

আমি নতমস্তকে বললাম, "হ্যাঁ।"

"কেন খুলেছিলেন?"

ততক্ষণে আলো এসে গেছে। আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম, তা বড়ই মর্মান্তিক। ঘরের মধ্যে সুজয়ের দেহটা ঝুলছে। সে ছাড়া সেই ঘরে আর কারও অস্তিত্বই নেই। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সেই রাতেই আমি মাধবী লজ ত্যাগ করে স্টেশনের কাছে এক বাঙালির বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ওদের মুখেই শুনলাম, কিছুদিন আগে মাধবী লজের ওই ঘরটিতে এক যুবক আত্মহত্যা করেন, তারপর থেকে ওই ঘরটি বন্ধই থাকে। কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না।

ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সেই রাতেই আমি সুজয়ের বাবাকে টেলিগ্রাম করলাম। টেলিগ্রাম করতে গিয়ে এমনই এক সংবাদ পেলাম, যাতে আমার চিত্ত দারুণভাবে বিচলিত হল। সংবাদটি হল, মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় ভ্যান থেকেই নাকি সুজয়ের লাশটি উধাও হয়ে যায়। কাল ওর বাড়ির লোকেরা এলে কীভাবে যে কী কৈফিয়ত দেব তা ভেবে পেলাম না। বেশ তো একা আমি আসছিলাম। কেন যে জড়াতে গেলাম ওকে, তা ভেবেই মন খারাপ হয়ে গেল। তবুও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

ফিরে আসতেই আর-এক চমক। যে বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, "ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন, একদিকে দু'বন্ধুতে বেড়াতে এসে একজনকে হারিয়ে বসলেন। অন্যদিকে ট্রেনের কামরায় হারিয়ে যাওয়া জিনিস ঘরে বসেই ফেরত পেলেন।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "ট্রেনের কামরায় হারিয়ে যাওয়া জিনিস মানে? আমার তো কিছুই হারায়নি।"

"সে কী! না হারালে এটা তা হলে কার?"

আমার দু' চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। এ যে ট্রেনের কামরায় ফেলে-আসা মেয়েটির সুটকেস! বললাম, "এ আপনি কোথায় পেলেন?"

"একটু আগে একটি মেয়ে এসে দিয়ে গেছে আপনাকে।"

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। বুকের ভেতরও ঢিপঢিপ করতে লাগল। এবার কি আমি ওর গ্রাস? বললাম, "কিছু কি বলে গেছে?"

"বলেছে। আপনারা নাকি একই ট্রেনে আসছিলেন। ভুল করে সে আপনার সুটকেসটি নিয়ে যায়। তাই এটি ফেরত দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, অম্বিকা কুণ্ডুর বাড়িতে আপনাকে একবার দেখা করতে।"

কে অম্বিকা কুণ্ডু তা জানি না। কোথায় থাকেন জানি না তাও। তবে আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে সুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

ভদ্রলোক বললেন, "করেন কী, করেন কী মশাই? এই রাতদুপুরে কোথায় চললেন? একে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল, তার ওপর অচেনা জায়গায় কার খপ্পরে পড়বেন তার ঠিক কী?"

কিন্তু আমার মধ্যে তখন আর আমি কি আছি? কী এক অদৃশ্য শক্তি ভর করে আমাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। কোথা দিয়ে কীভাবে যে গেলাম তা এখনও আমি মনে করতে পারি না। তবে একটা প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"এটা কি অম্বিকা কুণ্ডুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ। একটু দাঁড়ান।"

আমি দাঁড়িয়েই আছি। এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক সুবেশা তরুণী। তাকে দেখেই আমার হাত থেকে সুটকেসটা পড়ে গেল। আমি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে জ্ঞান হারালাম।

পরদিন সকালে জ্ঞান যখন ফিরল, তখন দেখি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার চারপাশে। সবাই বলল, "কী ব্যাপার! কাল হঠাৎ কী হল আপনার? কাকে দেখে অমন ভয় পেলেন?"

আমি তখনও সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। কেননা মেয়েটি আমার পাশেই বসেছিল। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "ও কে? ওকে চলে যেতে বলুন। ওকে দেখেই আমি ভয় পেয়েছিলাম।"

সরে যাওয়া দূরের কথা, ও আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কেন, চলে যাব কেন? আমি কি ভূত না পেত্নি? তা ছাড়া আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তা ভোলবার নয়। ওই সুটকেসের ভেতরে দশ ভরির মতো সোনর গয়না আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। ও জিনিস হাতে পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয় না। আপনি মহানুভব তাই ফেরত দিতে এসেছেন।"

আমি বললাম, "দেখুন, আমার যেন কীরকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আপনি কে?"

"আমি চন্দনা। কিন্তু ওই সুটকেস আপনার হাতে এল কী করে?"

"কেন, আপনিই তো দিয়েছেন।"

"আমি দিয়েছি? একটু মনে করে দেখুন তো কীভাবে কী হল। মনে হচ্ছে অলৌকিক ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে।"

আমি এবার সাহস পেয়ে উঠে বসলাম। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বললাম ওদের। সব শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওরা। তারপর ওদের মুখে যা শুনলাম তা আরও মর্মান্তিক।

চন্দনারা দু'বোন। বন্দনা ও চন্দনা। যমজ বোন ওরা। যারা মায়ের সঙ্গে দুর্গাপুরে থাকে। এটা ওদের মাসির বাড়ি। একবার বন্দনা পরিচিত একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে বাড়িতে প্রচণ্ড আপত্তি ওঠে। বন্দনা তাই এক রাতে ওরই বিয়ের জন্য রাখা গয়না ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। হয়তো সে মাসির বাড়িতেই আসত। কিন্তু দুর্দৈবে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সেও ছিল এক দুর্যোগের রাত। স্টেশনের কিছু লোক ওকে মধ্যরাতে সাপ্তাহিক নর্থ-বিহার এক্সপ্রেসের চলন্ত গাড়িতে উঠতে দ্যাখে। কম্পার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় সম্ভবত ভেতরে ঢুকতে পারে না বেচারি। পরে কিছুদূর যাওয়ার পর দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে হাত ফসকে পড়ে যায়। পরদিন ওর ডেডবডি পাওয়া গেলেও এই সুটকেসের সন্ধান কেউ দিতে পারে না।

আমি বললাম, "আশ্চর্য, যদি ওর প্রেতাত্মাই আমাকে দেখা দিয়ে থাকে তা হলে বারবার ও ট্রেনের টয়লেটের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল কেন?"

"সেটা তো আমাদের পক্ষেও বলা শক্ত। তবে মাধবী লজের যে ঘরে কাল রাতে ওই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে সেই ঘরে এক যুবক বন্দনার দুর্ঘটনার খবর কাগজে বেরনোর পরই আত্মহত্যা করে। হয়তো এমনও হতে পারে ওই ছেলেটিই বন্দনার পরিচিত সেই ছেলে।"

যাই হোক। পরিচয়-পর্ব সেরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় চমকের পর চমক। হঠাৎ দেখি মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সুজয় এসে হাজির। নেহাত দিনেরবেলা তাই, না হলে হার্টফেল করতাম। তবুও আমার শরীরের সমস্ত রক্ত তখন মুখে এসে জমাট বেধেছে। কোনওরকমে বললাম, "সুজয়-তু-তু-তুই!"

"হ্যাঁ আমি। কী সব উলটোপালটা টেলিগ্রাম করেছিস? তোকে কি ভূতে পেয়েছে না মাথা খারাপ হয়েছে তোর? আমি তোর সঙ্গে এলাম কখন, যে আত্মহত্যা করব?"

"এলাম কখন মানে? মাধবী লজে একবার চল তো, সবাই সাক্ষী দেবে তুই এসেছিলি কিনা?"

"কী আশ্চর্য! তুই বিশ্বাস কর, সে রাতে ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ঘর থেকে বেরোতেই পারিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম তুইও বোধ হয় যাওয়া ক্যানসেল করেছিস। কিন্তু তুই যে কার সঙ্গে এসেছিস তা ভগবানই জানেন। কাল তোর টেলিগ্রাম পেয়েই মাথা ঘুরে গেছে আমার। ভাবলাম, আমি না যাওয়ায় রসিকতা করে টেলিগ্রাম করেছিস। কিন্তু এটা যখন বাবাকে, তখন কেন জানি না মনে হল কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। তাই মা-বাবা দুজনকেই নিয়ে এসে হাজির করেছি।"

সুজয়ের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এবং আমার যে মাথা খারাপ হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ মাধবী লজের গফুর থেকে স্থানীয় সকলেই অকপট স্বীকৃতি দিলেন। এমনকী মর্গে নিয়ে যাওয়ার পথে লাশ উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও গোপন রাখলেন না কেউ। ভৌতিক ঘটনার এমন রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা আমাদের সকলকেই বিস্মিত করল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অরণ্যদেব লি ফক

দুম
?
ভূতুড়ে বাঘরা অরণ্যদেবকে ভূতুড়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেছে। ওঁকে আর দেখতে পাব না। চলো, যাই।
ওঁর জানোয়ার দুটো নিয়ে যাই...এখানে রেখে গেলে বাঘ কিংবা বুনো কুকুরে খেয়ে ফেলবে।

নেওয়া যাবে না...
গরর্

ওদের ধরা যাবে না। প্রভুর সঙ্গে ওরাও মরুক।

চলমান অশরীরী কি মরতে পারে?
হ্যাঁ। ভূতুড়ে বাঘ আর ভূতুড়ে বাঘ-রাজা ওঁকে মারতে পারে।

তোমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছি। বোকামি করে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারো।
আমি এখানে...এলুম কী করে?

...আর তুমি কে?
আমার বাচ্চারা তোমাকে এখানে এনেছে। তুমি কে তা অনুমান করতে পারি।

মুখোশ-পরা লোক...যাকে বুনোরা বলে অরণ্যদেব...ওদের সঙ্গে এসেছ...
...আমাকে খুন করতে!
সত্যি নয়...

তুমি ওদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ...তোমাকে মরতেই হবে!
!
8-23

অরণ্যদেব লি ফক

ভুতুড়ে বাঘের বাড়ির বাইরে... ডেভিল আর হিরো তাদের প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে...

ঢাকের শব্দে খবর ছড়াচ্ছে...
অরণ্যদেব মরে গেছেন...ভুতুড়ে বাঘ-রাজা খুন করেছে

ভুতুড়ে বাঘ-রাজা আর তার ভুতুড়ে বাঘের পাল...
আমাকে খুন করতে বুনোরা তোমাকে পাঠিয়েছে। ওরা অনেক বছর চেষ্টা করে পারেনি... এখন তুমি...
সত্যি নয়। আমি কাউকে খুন করতে আসিনি...

তোমার পিস্তল দিয়েই তোমাকে খুন করতুম...কিন্তু আমার বাচ্চারা গুলির শব্দে অভ্যস্ত নয়। ওরা ভয় পেতে পারে।
বিবেচকের কাজ... এখন শোনো...

৪-৩০
আমি খুন করতে আসিনি।

তোমাকে মেরে ফেলার আগে তোমার মিথ্যে কথাগুলি শোনা যাক...অরণ্যদেব।

তোমার "বাচ্চাদের" একটা...ওইটা... জখম হয়েছিল। আমি ওর গা থেকে বর্শার ফলা বের করে নিই। ওর গলায় একটা কলার আমার হাতে ঠেকে।
আমার কৌতূহল হয়... ওর পিছু নিয়ে এখানে আসি।

বোকার মতো মিথ্যে কথা। আমার বাচ্চাদের অত কাছে গেলে কেউ বেঁচে থাকে না।
গোয়েন্দা, এবার মরো!
ক্রমশ

ভূতের গল্প

ভূত দেখা কলা বেচা

শিবতোষ ঘোষ

ভূপতি তখন ক্লাস এইটে পড়ে। এইট মানে গ্রামের এইট, বেশ বড় ছেলে। ডিমৌলির সেই বিখ্যাত চড়াই-এ সাইকেলে ডবল-রাইট তুলে দিয়েছিল বাজি ধরে। ইতিমধ্যেই তার পঞ্চাশের ওপর হিন্দি ছবি দেখা হয়ে গেছে।

রতনদার সঙ্গে ভাণ্ডারিয়ার কালীমেলায় যাবে ভূপতি। বেগুনবাড়ির কালী আর ভাণ্ডারিয়ার কালী, এই দুই কালীমাতার বিরাট নামডাক এ-চত্বরে। ভাণ্ডারিয়ার পাঁঠাবলির সংখ্যা 'গিনেস বুক'-এ ওঠার মতো, একবার বলি পড়েছিল ২৪০০। এক কুইন্টাল পর্যন্ত এক-একজনের বাতাসা মানত থাকে, সুবিশাল চাঙারি ভরে মানত শোধ করে। এক-একটা বাতাসার আকার নাকি ছোটখাটো শতরঞ্জির মতো। এই সব শুনে ওই মেলায় যাওয়ার কৌতূহল অনেকদিন থেকে ভূপতির।

রতনদাই একদিন বলল, "ভূপতি, ভাণ্ডারিয়ার কালীমেলায় যাবি, চৈত্র মাসের লাস্ট শনিবার ?"

"যাব মানে ! কিন্তু ট্রেনে যেতে হয়, মা ছাড়বেন না !"

"আরে, আমার মামাশ্বশুর যাবেন, কোনও চিন্তা নেই ! আমি মাসিমাকে বলে দেব ! তুই জামাপ্যান্ট ইস্ত্রি কর, টাকাপয়সা জোগাড় কর। একটু বেশি করে টাকাপয়সা নিবি, সারা রাতের মেলা, রাত জাগলে খিদে পায় ! আর ভোরের দিকে শীত আছে রে, একটা মাফলার নিয়ে নিবি !"

নির্বিঘ্নে সব গোছগাছ হয়ে গেল তাদের। রতনদার কথায় তার মাও রাজি হলেন। তিনি বলে দিলেন, "দেখো বাবা, ও খুব দুষ্টু আছে !"

"আপনি কোনও চিন্তা করবেন না মাসিমা। মনে নেই, আমরা ডিমৌলি ঘুরে চলে এলাম সাইকেলে, আর আমার মামাশ্বশুর সঙ্গে যাচ্ছেন !"

রতনদা ভূপতিকে পুকুরপাড়ে টেনে এনে বলল, "ন্যাথ, আমাকে সকালেই চলে যেতে হচ্ছে, মামাশ্বশুরের বাড়িতে নেমন্তন্ন। তোর কোনও চিন্তা নেই, হরি মণ্ডলকে বলেছি, সেও যাবে বলেছে, তোরা সন্ধের মুখে আমার মামাশ্বশুরের বাড়ি চলে আয়। ওখান থেকে আমরা মাছের ঝোল ভাত খেয়েদেয়ে ন'টার ট্রেন ধরব। সারা রাতের মেলা, সারা রাত ঘুরতে হবে, সে জন্য দেরি করে বেরনোই ভাল। তোরা সন্ধের আগে চলে আসবি কিন্তু !"

বিকেলবেলা হরি মণ্ডল এসে বলল, "ভূপতি, আমি মেলায় যাব, কিন্তু আমার একটু দেরি হবে !"

ভূপতি জিজ্ঞেস করল, "তা কত দেরি ?"

"সাতটা, সাড়ে-সাতটার দিকে বেরিয়ে পড়ব। আসলে বাবা পাঁচখুরি হাটে গেছেন, হাট থেকে না ফেরা পর্যন্ত পয়সাকড়ি পাব না। আমার হাতে টাকা থাকলে তো আমরা রতনের সঙ্গেই চলে যেতাম। দুপুরে মাংস-ভাত খেয়ে টেনে ঘুম, তারপর মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে পান চিবোতে-চিবোতে ট্রেন ধরতে যাওয়া..... !"

হরি মণ্ডল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ভূপতি, তুই কিন্তু অপেক্ষা করবি, আমি তোর বাড়ি থেকে তোকে ডেকে নেব !"

ভূপতিকে রাত আটটা পর্যন্ত আটকে রাখল হরি মণ্ডল।

"আর একটু বোস, বাবা এই এলেন বলে !"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলেন না। ন'টায় ট্রেন ! রতনদার মামাশ্বশুরের বাড়ি এখান থেকে দৌড়লেও আধঘণ্টা লাগবে। সে আর বসল না, একা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল তার রতনদার মামাশ্বশুরের গ্রাম শোভানিপুরের উদ্দেশে। ভূপতি মনে-মনে বলছে আর দৌড়চ্ছে, "আমি মাছ-মাংস চাই না, পানও তো খাই না, শুধু যেন রতনদার দেখা পাই, তারা যেন চলে না যায় ! তা হলে আমার মেলায় যাওয়া হবে না ! না, আমি মেলায় যাব, যাবই !"

ঘন অন্ধকার, অমাবস্যার রাত, শনিবার। ভূপতির অন্ধকারকেও ভয়,

অমাবস্যাকেও ভয়, শনিবারকেও ভয় ! এই এত ভয় নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে সে যখন শোভানিপুরে পৌঁছল তখন রাত সাড়ে-আটটা। তার হাফ প্যান্ট পরনে কিন্তু হাতে ঘড়ি ছিল।

মামাশ্বশুরের উঠোনে একটা ফাঁকা দড়ির খাটিয়া। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল আশঙ্কায়। নিশ্চয়ই গরমের জন্য বাইরে বসেছিল রতনদা। কিন্তু ভূপতির ছ্যাঁত করাটা এমন হয়ে গেল যে, ওই দড়ির খাটিয়ায় ঠোকা হয়ে গেল। দুদ্দাড় করে পড়ে গেল। শব্দ শুনে ভেতর থেকে, "কে, কে ?" পরে ভূপতি শুনেছে অন্ধকারে তাকে নাকি গোরুচোর ভেবেছিল বাড়ির লোকজন। সে নাকি ঘরের দিকে না গিয়ে গোয়ালের দিকে চলে যাচ্ছিল।

হ্যারিকেন তুলে রতনদার মামাশাশুড়ি বেরিয়ে এলেন।

ভূপতি বলল, "আমি ভূপতি, রতনদা কোথায় ?"

মামিশাশুড়ি বললেন, "ওরা তো চলে গেছে, সে তো অনেকক্ষণ ! তুমি, আর হরি মণ্ডল, তোমাদের আসার কথা বলেছিল।"

"ওই ওর জন্যই আমার এত দেরি হয়ে গেল !" বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ভূপতি। জানেন, হরি মণ্ডল আমাকে বসিয়ে রাখল আটটা পর্যন্ত, আর এল না !" গলা ফেটে কান্না আসছে, আটকায় ভূপতি।

তা হলে মেলায় যাওয়া হবে না, মা-কালীর দর্শন হবে না ? মা বলে দিয়েছেন, "মন্দিরে যাবি, পুজো দিবি, প্রসাদ নিয়ে আসবি !" না, আমি যাবই। ভূপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে।

"এখান থেকে জকপুর স্টেশন কতটা রাস্তা হবে মামিমা ?"

"না বাবা, তুমি যেয়ো না ! তুমি তোমার মা'র একমাত্র সন্তান, ত্রিসংসারে তাঁর কেউ নেই। আমি তোমাকে এই ঘোর অমাবস্যার রাতে...আবার শনিবার !"

"কিছু ভয় নেই মামিমা, আমি ভূতে বিশ্বাসই করি না।"

এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "ও কে বউমা ?"

"আমাদের জামাই রতনের বন্ধু ভূপতি !"

পরিচয় দিতে আরও দেরি হবে, এর পর বাবার নাম কী ? কোন ক্লাসে পড়ো, বাড়িতে কে কে আছেন ও আছে ! ভূপতি তাড়াতাড়ি বলে, "আমি যাচ্ছি মামিমা।"

"একেবারে রাস্তার সামনেই একটা শ্মশান আছে বাবা ! শ্মশানের পাশেই বিশাল এক কালো জলের দিঘি, আর পাড় জুড়ে কাঁটাগুল্মের জঙ্গল। রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি দুটো ডালভাঙা অশ্বত্থগাছ। বনে শেয়াল, শকুন, আর তেনারা তো আছেনই !" তেনারা মানে সাপ, রাতের বেলা সাপের নাম ধরতে নেই।

"তোমার কাছে তো টর্চও নেই !"

বৃদ্ধা বললেন, "ও বউমা, ভূতের কাছে আলো কী, আর আঁধার কী, দুই-ই সমান। ছেলেকে যখন মা অত করে টেনেছেন তখন যেতে দাও, বাধা দিয়ো না ! মা-কালীর দর্শন করতে যাচ্ছ, যাও, যাও ! তুমি মায়ের নাম করতে-করতে চলে যাবে, বড় জাগ্রত দেবী !"

মামিমা বললেন, "তবু তোমার ভালর জন্যই বলছি বাবা, একটা গোমুখো ভূত আছে, ওই ডান সাইডের আশুদগাছের ডালে।"

ভূপতি মনে-মনে বলে, "আমার ভালর জন্য, আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছি, পা'কে দৌড় করাতে পারব কি না তাই সন্দেহ হচ্ছে !"

"সাবধানে যেয়ো ! বাড়িতে এখন এমন কেউ নেই যে, ওই ভূত-দিঘিটা পের করে দেওয়ার জন্য তোমার সঙ্গে পাঠাই।"

"আমি চলে যাব মামিমা, চিন্তা করবেন না !"

"কিন্তু চিন্তার কথা যে বাবা, তোমার মামা, মানে রতনের মামাশ্বশুরকেই একবার ধরেছিল....।"

ভয়ে রতনদার মামিশাশুড়ির বাকি কথা আর শুনল না ভূপতি, লুকিয়ে কানে আঙুল দিল।

"তুমি একটু জলটল খেলে না ? ট্রেন পেয়ে যাবে, মাঠের ভেতর দিয়ে সোজা মেঠো সড়ক, একেবারে ইস্টিশান। কতটা আর রাস্তা হবে, ক্রোশটাক !"

ভূপতি বলে, "না মামিমা, আমি কিছু খাব না, আজ চলি, থ্যাঙ্ক ইউ !"

মাথার একদম ঠিক নেই ভূপতির, সঙ্গে-সঙ্গে জিভ কাটে, "মামিমাকে থ্যাঙ্ক ইউ বলে ফেললাম, ছি-ছি !"

ভয় পেলে মাটির দিকে মুখ করে হাঁটতে হয়। ভূপতি মুখ নুইয়েই হাঁটছিল, সে হাঁটা নয়, দৌড়নো। কিন্তু মাথা তুলতেই হল একটা ভয়ঙ্কর ঝটপট শব্দে। দেখল সেই ভূত-দিঘির পাড়ে এসেছে সে। দিঘি ভরা জল করে টলমল, এ-দিঘি সে-দিঘি নয়, যেন একরাশ কু-ঝিকঝিক

অন্ধকার গোটা পৃথিবীটাকে গ্রাস করার জন্য উঠে আসছে। তাকে দেখে ছলাত করে এক চাপ অন্ধকার ছুড়ে দিল তার দিকে ওই কালো দিঘিটা। ভূপতি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, মা-কালী, মা-কালী, রাম, রাম, মা-কালী, মা-কালী, রাম, রাম। ঘেমেনেয়ে যাচ্ছে দৌড়তে-দৌড়তে, কিন্তু দিঘিটা পার হতে পারছে না। হঠাৎ কী-একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গেল দশ হাত। "উঃ মা গো" প্রায় দশ মিনিট পরে ককিয়ে উঠল ভূপতি।

সে ওই হোঁচট খেয়েই দিঘি পেরোয়। জামা খুলে হাওয়া করছে বুকে, একটু দম নিচ্ছে ভূপতি।

কোথাও কোনও আলোর পরশ নেই, একটা পূর্ণ অন্ধকারের রাজত্বে ঢুকে পড়েছে ভূপতি। এখানে মাটি অন্ধকার, গাছ অন্ধকার, মানুষ অন্ধকার, চাঁদ, নক্ষত্র, অমাবস্যায় চাঁদ থাকে না, নক্ষত্রও থাকে না ! দিঘির ভূতের এত ক্ষমতা, সে শুধু পৃথ্বী গ্রাস করেনি, ব্রহ্মাণ্ডকেও গ্রাস করেছে।

মুখে ঠাকুরনাম জপ করতে-করতে

হাঁটছিল ভূপতি। মোটা হাফ প্যান্ট, হাতকাটা গেঞ্জি, জামা ঘাড়ে। কত শৌখিন ড্রেস করে বেরিয়েছিল. আরতিদি'র পাউডার মেখে বেরিয়েছিল, মাসতুতো দিদি, দুপুর থেকে বেরোচ্ছে, ওইরকম নামী একটা মেলায় যাবে, পকেটে পকেট-চিরুনি, কাচা পার্ট-করা রুমাল। কিন্তু এখন কোথায় রুমাল, পাউডার, কোথায় পকেট-চিরুনি। ভূপতি এখন ভূতের খপ্পরে পড়েছে, এখন বাঁচার লড়াই, শৌখিনতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন মা-কালীর নাম ও রামনাম এই হচ্ছে সম্বল।

ভূপতি হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ দেখল তার আগে-আগে হাঁটছে একটা ছাগল : ছাগল দেখেই লাফিয়ে ওঠে ভূপতি, সত্যি ছাগল তো ? স্পষ্ট করে দেখল, না অন্য কিছু নয়। কুকুর হতে পারে কিন্তু ছাগলের হাঁটা আর কুকুরের হাঁটা এক নয়। সে ছাগল ও কুকুরের হাঁটা বিলক্ষণ চেনে। আবার এ ছাগল পাঁঠা-ছাগল। পাঁঠা-ছাগলের ঘাড় মোটা হয়।

ভূপতির একটু সাহস হল, তবু তার সঙ্গে একজন আছে, ছাগল হলেও তো প্রাণী !

ছাগলটা সামনে যেতে-যেতে তার পাশে চলে আসে, প্রায় গা ঘেঁষে, পর মুহূর্তে আবার বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে, আবার সামনে। একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার ডান দিক, একবার বাঁ দিক, সে দাঁড়িয়ে পড়লে দু'হাত দূরে ছাগলটাও দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে চক্রবৎ ভূপতিকে ঘিরে হাঁটতে লাগল ছাগলটা। কিন্তু ছাগলটা তাকে এভাবে ঘিরে-ঘিরে যাচ্ছে কেন ! সে চৈত্র মাসের এত গরমেও হাড়-কাঁপানো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। একসময় আর পারল না, মাঠ কাঁপিয়ে আ-আ করে পড়ে গেল ভূপতি। একটু পরে উঠল কিন্তু আবার সেই ছাগল। "উঃ, মা গো !" কাঁদতে লাগল ভূপতি।

ভূপতির মনে হল এ নিশ্চয় গোমুখো ভূত। এই ভূত শুধু গোরুর মতো মুখ নয়, নানা আকৃতি ধারণ করতে পারে। সে শুনেছে গোমুখো পায়ের তলা দিয়ে একবার গলে যেতে পারলে ব্যস, আর তাকে যেতে হবে না, একই জায়গায় তাকে সারা রাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মেরে ফেলবে। এই ভয়ে সে আর পা ফাঁক করেও হাঁটতে পারল না, দু' পা জড়ো করে পায়ে শেকল বাঁধা কয়েদির মতো হাঁটতে লাগল। মুখে রামনাম, মা-কালী, মা-কালী, আর একসঙ্গে জড়ো করা দুটো পা টেনে-টেনে তার সর্ব শরীর এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে, দশ হাত যেতেই তাকে দু'বার দাঁড়াতে হচ্ছে। তার এমন ধারণা হয়ে গেল যে, সে ভূতের কবলে পড়ে গেছে, আর কোনওদিন স্টেশনে পৌঁছতে পারবে না।

কোনদিকে যাচ্ছে, ঠিক যাচ্ছে না বেঠিক, কিছুই বুঝতে পারছে না ভূপতি। সে একসময় এমন হতাশ হয়ে পড়ল যে, মেলায় যাওয়া তো দূরের কথা বাঁচার আশাই ছেড়ে দিল। ভূপতি কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, "আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি মারা গেলে মা আর বাঁচবেন না !"

এর পর চোখ বন্ধ করে হাঁটতে লাগল ভূপতি। কী হবে চোখ খুলে। অন্ধকার, আর অন্ধকারের ছাগল,এ ছাড়া তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। ছাগলটাই তাকে ঘিরে-ঘিরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না।

এরকম চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ হাঁটছিল, কিন্তু কী হল, হঠাৎ চোখ খুলে ছাগলটাকে আর দেখতে পেল না। অ্যাঁ ! ছাগলটা গেল কোথায় ? সামনে-পেছনে-পাশে, কোথাও নেই ! একেবারে উধাও।

অবাক কাণ্ড। চোখের সামনে থেকে ছাগলটা সরে যেতেই দেখতে পেল সামনে জকপুর স্টেশনের আলো জ্বলছে। তার মানে ভূপতি ঠিক এসেছে ! সে সঙ্গে-সঙ্গে তীরের মতো আলোর দিকে ছুটতে লাগল।

স্টেশনের প্লাটফর্মে উঠে দেখল একটা চায়ের দোকানে রতনদা ও তার মামাশ্বশুর, দু'জনে বসে-বসে চা খাচ্ছেন। ভূপতি দড়াম করে গিয়ে পড়ল তাঁদের পায়ের কাছে, পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

জ্ঞান ফিরেই ভূপতির প্রথম কথা, "রতনদা, আমি ভূতের হাতে পড়েছিলাম, ভাগ্যজোরে জানে বেঁচেছি।" বলে সে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

"ভূত !"

রতনদা চা-দোকানির আঁচধরানো ভাঙা তালপাতার পাখাটা নিয়েই হাওয়া করে

যাচ্ছিল। তার মামাশ্বশুর এখনও সমানে ভূপতির চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভূত শুনে ঘাবড়ে গেছে রতনদা। জিজ্ঞেস করে, "কোথায় ভূত রে ভাই ভূপতি ?"

ভূপতি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। যা জোরে-জোরে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন রতনদার মামাশ্বশুর, দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এই জলের ঝাপটার চোটেই ভূত পালাল কি না কে জানে ! ভূপতি উঠে পড়েছে তবু জল-ঝাপটা মারতে উদ্যত হয়েছেন, ভূপতি তাঁর লোমভর্তি বলিষ্ঠ হাতখানা ধরে ফেলে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, "আপনার সেই গোমুখো ভূত গো মামা !"

"মামার ভূত ! মামার পোষা ভূত নাকি ? তুই যে কী বলিস ভূপতি !"

রতনদার মামাশ্বশুর বললেন, "না গো জামাই, আমাকেও একবার ভূতে ধরেছিল, সে এক বিতিকিচ্ছিরি বৃত্তান্ত। তা তোমার কেসটা কী ঘটল বলো দিকিনি ?"

ভূপতি অশ্বত্থ গাছের ডাল ভাঙা শব্দ থেকে...না তারও আগে থেকে হরি মণ্ডলের না-আসা দিয়ে গল্প শুরু করল, গল্প নয় সত্যি, একেবারে কারেন্ট ঘটনা, ভূত মিথ্যে হতে পারে কিন্তু অজ্ঞান হওয়া তো মিথ্যে নয় ! তবু ছাগল শুনে অনেকের উৎসাহ কমে গেল। চা দোকানের প্রায় বিশ-ত্রিশজন তাকে ঘিরে গল্প শুনছে।

"দূর, এ তো ছাগলের গল্প, ভূত কোথায় ?"

"চুপ কর, ছাগলও ভূত হয় ! হ্যাঁ বলো ভাই, তারপর কী হল ?"

"ছাগল, তায় আবার পাঁঠা, ভ্যা-ভ্যা করেছিল ?"

"আঃ, রাতের বেলা ছাগল অত চেল্লায় না, ও ঠিক দেখেছে, ওটা ছাগলই !"

"হয়তো কারও বাড়ির ছাগল, খোলা পেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তারপর অন্ধকারে রাস্তা ঠিক করতে পারেনি !"

"কত কিলো ওজন হবে রে ভাই ? আর একটু পথ আনতে পারলে না !"

রতনদা হঠাৎ সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এত হাসিঠাট্টা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ! আজ ভান্ডারিয়ার কালীপুজো, শনিবার, অমাবস্যা, দেখা দিল কালো পাঁঠা ! নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে।"

ভূপতি তাড়াতাড়ি বলে, "হ্যাঁ, হতে পারে, আমি রামনামের সঙ্গে অনবরত মা-কালীর নামও নিচ্ছিলাম।"

"আসলে মা-কালীই তোকে এ-যাত্রা ভূতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে রে ভূপতি, মা তোকে রক্ষা করলেন। এ-বাবদে মা'কে পাঁচ সিকের বাতাসা দিয়ে পুজো দিবি, বুঝলি !"

রতনদার মুখে মা-কালীর কথা শুনে অনেকে মুষড়ে পড়ে। বেশ মজা করে ভূতের গল্প শুনতে গিয়ে হয়ে গেল ছাগল, ছাগল হয়ে গেল পাঁঠা, সেও আবার মা-কালীর ! ভূত ভেবে মজা করে তারা যা-তা বলেছে, একজন তো ওজনের কথাও বলে ফেলেছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "আমার পাঁচ সিকে পয়সা নিয়ে যাবে, আমার হয়ে পুজো দিয়ে দেবে ? আমার নাম সর্বেশ্বর ওঝা। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, কেন যে বেফাঁস কথা বলতে গেলাম।"

রতনদার মামাশ্বশুর বললেন, "না, না, ওসব নয়, ও হল সেই গোমুখো ভূত, আমাকে ধরেছিল। ভূপতি দেখেছে ছাগল, আমাকে ধরেছিল বাছুর হয়ে, দু-তিন মাসের সাদা ধবধবে বকনা বাছুর। তোমরা ঠাকুর দেবতাকে ভূতের ক্ষেত্রে টেনে এনো না, মা আবার রুষ্ট হবেন !"

যারা এতক্ষণ ভূপতির ছাগলকে মা-কালীর বাহন-বাহন করছিল, তারা আবার কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। হয়তো ট্রেন এসে না গেলে তারাও পাঁচ সিকে করে পয়সা দিত মা-কালীর পুজো দেওয়ার জন্য।

॥ ৩ ॥

বিশাল মেলা, দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায় ভূপতির। খুব ঘুরল রতনদার সঙ্গে, ম্যাজিক দেখল, রুনপায় চড়ল। চোঙ নিয়ে একটা লোক চেঁচাচ্ছে, "যাঁরা রুনপায় চড়তে চান, চলে আসুন, নিজেকে পরীক্ষা করুন, এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, মাত্র পঁচিশ পয়সা।" ভূপতি ঘুগনি খেল, পরপর দু'প্লেট, মাংসের ঘুগনি।

বলি শুরু হল ভোর চারটেয়। কাতার দিয়ে লোক হাতজোড় করে। ছাগলটাকে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে প্রাণপণ চেল্লাচ্ছে, সমবেত গলায় সকলে বলে ওঠে, "নাও, মা, মা গো.... !" বলি হচ্ছে আর বলির শেষে একসঙ্গে বিশ-পঁচিশটা জয়ঢাক বেজে উঠছে ক্যাড়াং-ক্যাড়াং করে। একটা কোনায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন বন্ধু গুনতি করছে, তারা সংখ্যাটা জানতে চায়। মেলা কর্তৃপক্ষ চারশো বলিকে পাঁচশো বলে ভড়কি দিচ্ছে কি না তারা দেখবে। রতনদা ভূপতিকে বলে, "এই কী হল তোর, বলি গুনবি ?" ভূপতি চোখে আঙুল চাপা দেয়। ছাগলটা ভূত হোক আর যেই হোক, তাকে এই দৃশ্য দেখতে আসার ব্যাপারে বাধা দিতেই যে এসেছিল এখন সে বুঝতে পারল। ডবল হাড়িকাঠ, জোড়ায়-জোড়ায় বলি হচ্ছে, রক্তে নদী হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা।

রতনদার মামাশ্বশুরের এক আত্মীয় ফলের দোকান দিয়েছিলেন মেলায়। কয়েক হাজার লোক উপোস করে পুজো দিতে আসে, পুজো শেষে তারা প্রত্যেকেই ফল খেয়ে উপোস ভাঙে। সেজন্য মেলায় প্রচুর ফলের দোকান, সব দোকানেই প্রচুর বিক্রি। আত্মীয়ের নাম কালাচাঁদদা, তিনি একা সামলাতে পারছিলেন না। ভূপতির ইচ্ছে হল দোকানদারি করে।

সত্যি-সত্যি কলা বেচতে বসে গেল ভূপতি। কালাচাঁদদা চিঁড়েগুড় আনালেন, চিঁড়েগুড় খেতে-খেতে দাম বলছে ভাউম-ভাউম করে। মেলার মাঝখানে ত্রিপল টাঙানো দোকানের ভেতরে বসে সে আর রতনদা মনের সুখে খাচ্ছে আর হাসছে।

রতনদা বলল, "তোর সবচেয়ে লাভ হল ভূপতি।"

সে জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

"তোর ভূত দেখাও হল, কলা বেচাও হল ! রথ দেখা কলা বেচার মতন !"

মেলা কাঁপিয়ে দুজনে হাসতে থাকে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ভূতের গল্প

মীন দ্বীপের ভূত

রতনতনু ঘাটী

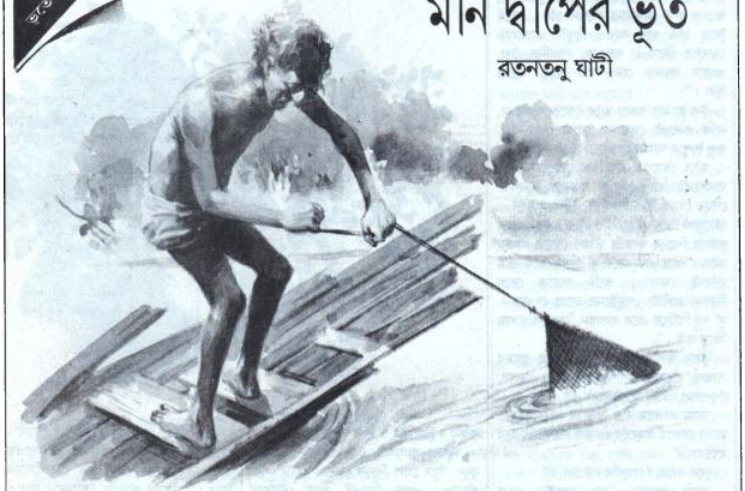

মীন দ্বীপের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে আমার মনে হচ্ছিল, টুরাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া ঠিক না। এত যদি ভয় তো বাড়িতে বসে থাকলেই পারত! নদীর খাঁড়িটা যেখানে দ্বীপের মাটিকে লাঙলের ফলার মতো দু' ভাগ করে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি টুরাকে বললাম, "তোর যদি এত ভয় তো, যা, বাংলোয় মা'র কাছে চলে যা। ফাইভে পড়িস, এখনও এত ভূতের ভয় তোর? তাও আবার দিনের বেলা?"

টুরা একটু উদাস হয়ে গেল যেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "না, আসলে ভয় নয় কুশলদা, দ্বীপটা একদম নির্জন তো!"

আমি হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, "নির্জন হলেই ভূত, রাম-সীতার পুত! সত্যি টুরা, তুই গল্প লেখক হতে পারবি বড় হলে। আর কী কী হলে ভূত হয় টুরা?"

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের উঁকি দেওয়ার মতো ম্লান একটু হাসল টুরা। বলল, "আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে কুশলদা। চলো, এখন বাংলোয় ফিরে যাই। খেয়েদেয়ে দুপুরে বেড়াতে আসব বরং।"

আমি বেশ হতাশ। কিছুটা কষ্টও হচ্ছিল। মীন দ্বীপে বেড়াতে আসার ইচ্ছে সেই কবে থেকে। এমন একটা নতুন দ্বীপ, ডাঙায় সাপ নেই, বাঘ-ভালুক নেই, জলে কুমির-হাঙর নেই। শুধু দূরে-দূরে এলোমেলো দু-দশটা খাঁড়ি আর অগোছালো সবুজ ঝোপঝাড় ছড়িয়ে আছে খুচরো পয়সার মতো। খুব বেড়াব, অ্যাডভেঞ্চার হবে খুব। তা না, টুরার ভূতের ভয় আর বুবুনের নৌকোর দুলুনিতে মাথা ঘোরার জন্য ভাল লাগছে না। এর চেয়ে আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে ক্রিকেট খেলা ঢের ভাল ছিল। বললাম, "চল তা হলে। বুবুনকে নিয়ে আমরা দুপুরে বেড়াতে বেরোব।"

আমি টুরা ও বুবুন ফিরে আসছিলাম বাংলোয়। হঠাৎ একটা বুনো ঝোপ প্রথমে চোখে পড়ল টুরার। আমার হাতটা চেপে ধরে টুরা বলল, "দ্যাখো কুশলদা, ঝোপটা কীরকম!"

আমি হেসে বললাম, "তোর বুঝি ভয় করছে? না, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। সেভেনে পড়ি, আমার তো কই ভয় পায় না। ফাইভে পড়িস বলেই কি তোর যত ভয়? চল না, ঝোপটার কাছে যাই।"

টুরা আমার পিঠের জামায় খামচে ধরে টান দিল। বলল, "ওটা কী ঝোপ বলো তো? ওর মধ্যে সাপটাপ তো থাকতেই পারে। কী দরকার.....।"

আমি ঝোপটার দিকে এগোতে-এগোতে বললাম, "সাপের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, একলা এসেছে এই নির্জন দ্বীপে বেড়াতে। এখানে সাপ থাকতেই পারে না।"

আমরা যখন ঝোপটার খুব কাছাকাছি গিয়েছি, দেখলাম কীরকম অদ্ভুত রঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলো দেখতে ঠিক যেন আধখানা চাঁদের মতো। ঝোপটার ঘন সবুজ পাতাগুলো যেন কালচে মেঘের দল। আর মাঝে বেগনি রঙের ঘাসজাতীয় পাতাগুলো আঁকিবুকি কেটে রেখেছে, দেখলে মনে হয়, যেন এইমাত্র সূর্যাস্তের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তারপরে ফুলগুলোর দিকে চোখ

পড়তেই মনে হল, ওমা, আধখানা রুপোর চাঁদও উঠে পড়েছে কখন ! একটা-দুটো নয়, অনেক ক'টা আধখানা রুপোর চাঁদ। আমি টুরার হাত ধরে আরও কিছুটা এগোলাম ঝোপের দিকে। বললাম, "জানিস টুরা, এখানে কাদের যেন আজ বসে আঁকো ছিল।"

টুরা আমার কথার মানে বুঝতে পারল না, নাকি শুনতেই পেল না, বোঝা গেল না। শুধু টানতে থাকল পেছনে।

হঠাৎ ঝোপের ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে তাকাতেই দেখি দুটো বড়-বড় চোখ। পেছন থেকে উঁকি দিয়েছিল টুরা ও বুবুন। তাদেরও চোখ এড়ায়নি। টুরা এক হাতে আমার পিঠের জামাটা ভীষণ জোরে খামচে ধরল। আর এক হাতে দু' চোখ ঢেকে প্রায় কেঁদেই ফেলল। আমি পলকে দেখে নিলাম, প্রাণীটা পেঙ্গুইনের মতো দেখতে। দু' পা পিছিয়ে এসে বললাম, "চল, বাংলোয় ফিরে যাই।"

টুরার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে গাছের পাতায় ভোরের শিশিরের মতো। বলল, "কুশলদা, ওটা কিসের চোখ ?"

আমি বললাম, "ও কিছু না। পেঙ্গুইনের মতো দেখতে সমুদ্রের কোনও পাখিটাখি হবে হয়তো।"

বুবুন বলল, "পেঙ্গুইন নয় তো ?"

আমি বললাম, "দুর, পেঙ্গুইন থাকে শীতের দেশে বরফের রাজ্যে। সে এই হলদিয়া বন্দরের সামনের দ্বীপে আসতে যাবে কেন ? এলেও বাঁচবে না তো। অন্য কোনও পাখি বা সমুদ্রের হাঁসটাসও হতে পারে।"

আমরা হাঁটতে লাগলাম। উঁচু-নিচু দ্বীপের মাটি। ঠিকমতো পা ফেলা যায় না। আমি ধরে আছি টুরার হাত। বাংলো দেখা যাচ্ছে। এমন সময় টুরা আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, "চোখ দুটো না ঠিক সেই ই. টি.র মতো। তাই না কুশলদা ?"

টুরার কথা শুনে বুঝলাম, ওর মন থেকে এখনও ভয় যায়নি। 'ই. টি.' সিনেমাটা দেখার পরও টুরা বেশ ভয় পেয়েছিল মনে আছে। আমি অন্যমনস্কের মতো বললাম, "হুঁ।"

টুরা বলল, "আচ্ছা কুশলদা, ওটা যদি ই টি. হয় ? হতেও তো পারে। দূরের কোনও একটা গ্রহ থেকে এসে এই দ্বীপে.... ।"

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, "আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করুন যে পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে প্রাণী আছে। তারপর নয় ভয় পাস। আমার মতো সেভেনে যখন পড়বি, তখন এসব বুঝবি। ই. টি. তো নিছক

কল্পনা ! টুরা, তুই ভাবতেও পারিস বটে !"

আমরা বাংলোয় এসে গেলাম। এসে বুবুন বসে গেল ঝিনুক দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়তে। এখন নিশ্চয়ই আর নৌকোর দুলুনিটা বুবুনের মাথায় নেই।

টুরা বলল, "জানিস বুবুন, আমরা ঝোপের আড়ালে পেঙ্গুইনের মতো যে-প্রাণীটা দেখলাম, তার চোখ দুটো ঠিক ই. টি-র মতো, বড়, আর গোল, আর কীরকম যেন।"

বুবুন হাঁ করে তাকিয়ে রইল টুরার দিকে। আমি বললাম, "বুবুন, তোর আবার ভূতের ভয় নেই তো রে ?"

বুবুন ঘাড় দোলাল দু'দিকে, না নেই। আমি বললাম, "টুরার মতো ভয় পাস না যেন ! আমরা দুপুরে খাওয়ার পর বেড়াতে যাব আবার। তুইও যাবি সঙ্গে।"

মীন দ্বীপটা নতুন গড়ে উঠেছে। এখনও তেমন জনবসতি গড়ে ওঠেনি। এই দ্বীপে আসারও কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই বাবা একটা নৌকো ভাড়া করে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেইমতো টুরার বাবা-মা, বোসকাকু ও কাকিমা আর বুবুনের বাবা-মা, সামন্তকাকু ও কাকিমা এবং বাবা-মা'র সঙ্গে আমি বেড়াতে এসেছি এই মীন দ্বীপে। মা তো গোড়া থেকেই আপত্তি করেছিলেন। "কী দরকার, কোথায় কী বিপদে পড়ব। লোকজন নেই, কারও সাহায্যও তো পাওয়া যাবে না। সঙ্গে তো ছোট ছেলেমেয়েরা যাবে।" মায়ের আপত্তি শোনেননি বাবা। বাবার মনের মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে সবসময়। আর এই জন্যই বাবাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

নৌকোয় আসার সময় বাবা বলেছিলেন, "দ্বীপটা অনেকটা মাছের মতো দেখতে। হলদিয়া বন্দরের দিকটা মাছের মুখের মতো। লেজটা সরু হয়ে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। তাই দ্বীপটার নাম মীন দ্বীপ। দ্বীপটার একটা ডাকনামও আছে, নয়াচর।"

বাবার কথা শুনতে-শুনতে আমার মনে হয়েছিল, এ-সেই টিনটিনের কৃষ্ণদ্বীপ অভিযানের মতো। সঙ্গে আমাদেরও একটা কুট্টুস থাকলে ভাল হত !

মা, বাবা, কাকু, কাকিমারা এখন রান্নায় ব্যস্ত। আমি একটা ছোট বুনো গাছের তলায় বসে ভাবছিলাম। এমন সময় টুরা ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, "কুশলদা, চলো একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।"

আমি টুরার সঙ্গে গেলাম বাংলোর পেছনে, অনেকটা দূরে। টুরা আঙুল তুলে দেখাল ঝিলের জলের ওপরে বুজকুড়ি উঠছে। টুরা বলল, "অনেকক্ষণ থেকে আমি

দেখছি জলের নীচে কী যেন আছে।"

আমি বললাম, "থাকবে আবার কী? ও এমনিই হচ্ছে।"

বুবুন ঝোপে-ঝোপে ঘুরে গঙ্গাফড়িং ধরছিল। সেও এসে বলল, "কুশলদা, টুরাদি, তোমরা দেখবে চলো, একটা লজ্জাবতী গাছে না অনেক ফুল!"

টুরা বলল, "চলো তো কুশলদা।"

আমরা গিয়ে দেখলাম একটা লজ্জাবতী গাছের ডাল ফুলের ভারে যেন জলে নুয়ে পড়ছে। জলে তিরতির করে কাঁপছে তার ছায়া। সত্যিই অনেক ফুল ফুটেছে।

টুরা বলল, "আমি বলছি কুশলদা, এই দ্বীপটার সব কিছুই যেন অন্যরকম। কেমন ভয়-ভয়।"

বুবুনও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল টুরার কথায়। আমি হেসে বললাম, "তোর মাথা আর বুবুনের মুণ্ডু। গাছে ফুল ফুটেছে, তাতেই ভয়।"

আমরা হাঁটতে-হাঁটতে তিনজন একদম নদীর ধারে। এদিকটার নদীর নাম হুগলি। আর আমরা হলদিয়া টাউনশিপ থেকে যে নদী দিয়ে নৌকোয় করে এলাম, তার নাম হলদি। দুটো নদীই দ্বীপের দু'পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে পরে একসঙ্গে মিশেছে। তারপর সোজা বঙ্গোপসাগরে। বুবুন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দ্যাখো টুরাদি, দূরে একটা জাহাজ।"

টুরা সে-কথার উত্তর দিল না। নদীর ঢালু পাড়ে কী যেন দেখছিল। আমি বললাম, "এই টুরা, এদিকে আয়, দ্যাখ, কত বড় একটা সমুদ্র-কাঁকড়া।"

বুবুন ছুটে এল। টুরা মুখ তুলে শুধু তাকাল একবার। গোটা ফ্রকটাই কাদায় ভর্তি। থমথমে গলায় বলল, "কুশলদা, এদিকে এসো তো!"

আমি আর বুবুন টুরার কাছে যেতেই টুরা দেখাল কাদায় একটা মানুষের পায়ের ছাপ ক্রমশ জলের দিকে গিয়ে ডুব দিয়েছে নদীতে। আমি বললাম, "তুই এত ভয় পাস কেন? ওটা তো একটা মানুষের পায়ের ছাপ। কেউ জলে নেমেছিল হয়তো।"

টুরা দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, "মানুষের পায়ের ছাপ এত বড় হতেই পারে না। এটা অন্য কিছু। তুমি ভাল করে দ্যাখো কুশলদা, পায়ের ছাপটা কেমন অন্যরকম।"

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "অন্য আবার কীরকম?"

টুরা বলল, "এই দ্যাখো না, গোড়ালির ছাপটা কেমন সামনের দিকে।"

আমিও ভাল করে দেখলাম। হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পায়ের ছাপটা ভূতের বলে মানতে মন চাইছে না। বললাম, "তা হলে কেউ জল থেকে উঠে এসেছে দ্বীপে। কাদা তো তাই....."

টুরা এসে খামচে ধরল আমার জামা। আর বুবুন জাপটে ধরল আমার বাঁ হাত। আমি বললাম, "ভূতের পায়ের গোড়ালি সামনের দিকে থাকে আমিও গল্পে পড়েছি। তবে এখানে ভূত আসবে কোত্থেকে!"

এমন সময় বাংলোর দিক থেকে বাবার ডাক শুনলাম। আমি বললাম, "চল, খাওয়ার জন্য ডাক পড়েছে।"

বুবুন কোথা থেকে একগোছা ধুতুরা ফুল পেড়েছিল। ফুলগুলো পায়ের ছাপের দিকে ছুড়ে দিয়ে ছড়া কাটল বুবুন— "ধুতুরা ফুল খা, শিবের কাছে যা।"

পায়ের ছাপটা শিবের কাছে যাক না যাক, আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম। টুরার চোখে-মুখে যতখানি ভয়ের মেঘ, বুবুনের তার চেয়েও বেশি। আমার তেমন ভয় কিছু পায়নি। আমার মনে হল, বড় হলে একদিন যাব সেই জায়গায়, যেখানে ভূত আছে বলে অনেক গল্প শোনা যায়, দেখব, সত্যি ভূত আছে কি না।

খাওয়াদাওয়া হল খুব। সামন্তকাকিমা মাংসটা যা রেঁধেছেন, এককথায় দারুণ। বুবুন আর টুরা একদম ঝাল খেতে পারে না। তাই ওদের ঝালহীন মাংস রান্না হয়েছে। বড়দের খেতে সময় লাগছিল, ওঁরা সব নানারকম গল্প করছিলেন। মীন দ্বীপে একটা হাওয়াকল বসানো হয়েছে বাংলোয় আলোর ব্যবস্থা করার জন্য, এইসব গল্প।

এ-গল্প আমাদের ভাল লাগছিল না। আমি টুরা আর বুবুনকে রাজি করিয়ে মাকে গিয়ে বললাম, "মা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।"

মা তখন কী একটা কথার পিঠে বেদম হাসছিলেন। বাবা বললেন, "বেশি দূর যেয়ো না কিন্তু! একটু পরেই বেরিয়ে পড়তে হবে, সন্ধের আগে-আগেই।"

আমি সায় দিয়ে ঘাড় নেড়ে ছুট। টুরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। বলল, "ওদিকে যাব না কুশলদা। ওদিকে তো সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপটা আছে!"

আমি দু' হাত ঝাঁকিয়ে বললাম, "তুই সত্যি পারিস টুরা! আয় বুবুন।" তারপর আমরা সবাই মাছের লেজের মতো দ্বীপের দিকটায় হাঁটতে লাগলাম।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর বুবুনই প্রথম আবিষ্কার করল অদ্ভুত দেখতে একটা বড় পাথর। তীরের ফলার মতো গাঁথা হয়ে আছে দ্বীপের মাটিতে। পাথরটা দেখে আমার মনে হল, উল্কা আকাশ থেকে খসে পড়েছে মাটিতে। তখনই আমার মনে পড়ে গেল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটা

গল্পের কথা। সেই গল্পেও মীন দ্বীপের একটা পাথরের কথা ছিল। তা হলে কি সেই পাথরটাই এই পাথরটা ? বাঃ, বেশ তো !

টুরা অবশ্য বলল, "কুশলদা, এই বিচ্ছিরি দেখতে পাথরটা ছাড়া দ্বীপের এই দিকটা বেশ ভাল। সকালে এদিকে বেড়াতে এলেই ভাল হত।"

বুবুন একটু দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "টুরাদি, কত লাল কাঁকড়া দেখবে এসো।"

আমরা বুবুনের কাছে গেলাম। দেখলাম, সত্যি এ যেন লাল কাঁকড়ার দেশ। কী সুন্দর পুট-পুট করে ঢুকে পড়ছে ছোট-ছোট গর্তে। কাঁকড়াগুলোর গায়ের রংও কী সুন্দর।

দু'পাশে ছোট-ছোট ঝোপ, তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। আসলে রাস্তা নয়, কেউ রাস্তার মতো করে বানায়ওনি। তবু দেখলে মনে হয় এক সুন্দর বনপথ চলে গেছে দূরে। অনেকটা দূরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে। তার সঙ্গী কেবল নির্জনতা।

আমরা সেই বনপথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলাম নদীর প্রান্তে। বুবুন দু' হাত ভরে তুলেছে অনেক বনফুল, তার কিছু টুরাকেও রাখতে দিয়েছে। নদীর দিকে তাকিয়ে টুরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দ্যাখ বুবুন, দ্যাখো কুশলদা, একটা লোক নৌকোয় চড়ে নদীতে.....।"

আমিও দেখলাম। বললাম, "ও, লোকটা মাছ ধরছে জাল ফেলে।" তখনই আমার মনে পড়ে গেল, বাবা বলেছিলেন, দ্বীপটায় কোনও মানুষ নেই, শুধু বাংলোর দু'জন কাজের লোক ছাড়া। তারা বাংলোয় আছে দেখে এসেছি। তা হলে এই লোকটা এল কোত্থেকে ?

টুরা বলল, "যাবে কুশলদা, লোকটার কাছে ? বুবুন, যাবি ?"

আমিও উৎসাহে বললাম, "চল দেখি, লোকটা কী মাছ ধরছে।"

আমরা লোকটার কাছাকাছি হতেই দেখলাম, একটা ডাঙা নৌকোয় চড়ে নদীর খাঁড়িতে জাল ফেলছে লোকটা। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমরা যখন নৌকোয় চড়ে দ্বীপে এসেছিলাম, তখন একটা খাঁড়ির মুখে মাটিতে একটা ডাঙা নৌকো পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। নৌকোর দু' পাশের কাঠ ভাঙা, হালটাও অর্ধেকটা নেই। লোকটা যে-নৌকোয় চড়ে মাছ ধরছে, অনেকটা সেই নৌকোর মতো। ভাল করে তাকিয়ে দেখেই আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এ সেই ডাঙায় পড়ে থাকা ভাঙা নৌকোটাই। কিন্তু আশ্চর্য, নৌকোয় জল ঢুকছে না তো ! নৌকোটা জলে ভেসে আছে কী করে ?

এমন সময় টুরা আমার কানে-কানে বলল, "কুশলদা, নৌকোটা কেমন ভাঙা দ্যাখো। জলে ভেসে.... ।"

আমি হাত দিয়ে টুরার মুখটা চেপে ধরলাম। দরকার কী ওসব কথা বলার ! লোকটা শুনতে পেলে ?

বুবুন তখন ঝিনুক খোঁজায় ব্যস্ত। একটা বড় রঙিন ঝিনুক পেয়ে গেছে, তাই তার আনন্দের সীমা নেই।

লোকটা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। নিজের মনে জাল ফেলে যাচ্ছে। লোকটার মুখও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। নদীর দিকে লোকটার মুখ। আমি সাহস দেখানোর জন্য চেঁচিয়ে লোকটাকে বললাম, "ও কাকু, কী মাছ পেলে ?"

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। তা হলে কি আমার কথা শুনতে পায়নি। আমি যে ভয় পাচ্ছি, এ টুরা যেন বুঝতে না পারে, তাই আরও জোরে বললাম, "ও কাকু, তুমি যে মাছ ধরছ তোমার মাছ কই ?"

তখনও কোনও উত্তর এল না। আমি মনে-মনে ভাবলাম, লোকটা কেমন ! এমন সময় আমি লোকটার পায়ের দিকে তাকাতেই আমার দমবন্ধ হয়ে এল। কোনওরকমে একহাতে টুরাকে, অন্য হাতে বুবনকে ধরে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। টুরা আর বুবুন জিজ্ঞেস করছে, "ও কুশলদা, তুমি এত জোরে ছুটছ কেন ? কী দেখেছ ?"

আমি সেই সরু বনপথ ধরে অনেকক্ষণ ছোটার পর ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছি। শুধু পেছন ফিরে একবার তাকালাম। দেখি কোনও নৌকোও নেই, আর কোনও লোকও জাল ফেলে মাছ ধরছে না।

আবারও ছুটতে লাগলাম। বুবুন এবং টুরার হাত আমার দু' হাতে। ওরা মাঝে-মাঝেই চেঁচিয়ে বলছে, "ও কুশলদা, বলো না কী দেখলে, বলো না।"

যখন বাংলোর প্রায় কাছে চলে এসেছি, পলকের জন্য থামলাম। টুরা ও বুবুনকে বললাম, "যে লোকটা মাছ ধরছিল তার পায়ের গোড়ালি দুটো সামনের দিকে।"

টুরা বলল, "আমি তো নদীর পাড়ে তা হলে তখন এরই পায়ের ছাপ দেখেছি। তুমি তো তখন আমার কথা বিশ্বাস.... ।"

বুবুনও চেঁচিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, "কাউকে কিছু বলবি না। ভালয়-ভালয় হলদিয়া ফিরে যাই, তারপর।"

টুরা ও বুবুন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আমরা যখন বাংলোয় ফিরে এলাম, তিনজনেরই জামা ঘামে ভিজে গেছে। আমাদের ভয় পাওয়া থমথমে মুখ-চোখ দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এত ছোটাছুটি করেছ যে জামাটামা একদম ভিজে গেছে ঘামে।"

বোসকাকিমা বললেন, "তোমাদের কখন থেকে ডাকছি আমরা ! কোথায় গিয়েছিলে সব ? কারও মুখে যে আর কথা নেই।"

আমাদের কারও মুখ থেকেই কোনও কথা সরল না। সব গোছগাছ করাই ছিল। সবাই এসে নৌকোয় উঠলাম। আমাদের নৌকোর মাঝি সুদর্শন গায়েন নৌকো ছেড়ে দিল।

পশ্চিমে হলদিয়া বন্দরের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলোর মাথায় রঙিন আলো ছড়িয়ে সূর্য ডুবছে। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকটাই আবছা হয়ে এসেছে মীন দ্বীপ। সামন্তকাকিমা গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন। কিন্তু আমাদের তিনজনের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

নৌকো এসে পৌঁছল পাতিখালি। আমরা মাটিতে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়লাম। আমি বাবাকে বললাম, "মীন দ্বীপে আমরা একটা ভূত দেখেছি বাবা।"

বাবা হেসে বললেন, "ভূত আবার মীন দ্বীপে আসবে কোত্থেকে ? ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি ?"

আমার গলায় উত্তেজনা, "হ্যাঁ বাবা, আমরা দেখেছি একটা ভাঙা নৌকোয় চড়ে একটা লোক জাল ফেলে মাছ ধরছে। তার পায়ের গোড়ালি দুটো সামনের দিকে।"

টুরা আর বুবুন একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, ভূত !"

আমাদের তিনজনের কথায় বড়রা সবাই হোহো করে হেসে উঠলেন।

সুদর্শন গায়েন নৌকো থেকে আমাদের জিনিস নামাতে-নামাতে বলল, "তোমরা তা হলে তেনাকে দেখেছ।"

টুরা আর বুবুন আমার গা-ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। নদীর ঢালু বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। আমি আর একবার মীন দ্বীপের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মুখ লুকিয়েছে মীন দ্বীপ। দূরে শুধু দু-তিনটে বয়ার আলো মাঝে-মাঝে জ্বলছে-নিভছে।

মনে-মনে ভাবলাম, বড়রা যতই হেসে উড়িয়ে দিন, আমি আর কোনওদিন মীন দ্বীপে যাব না, এমনকী, বড় হলেও না।

ছবি : বিমল দাস

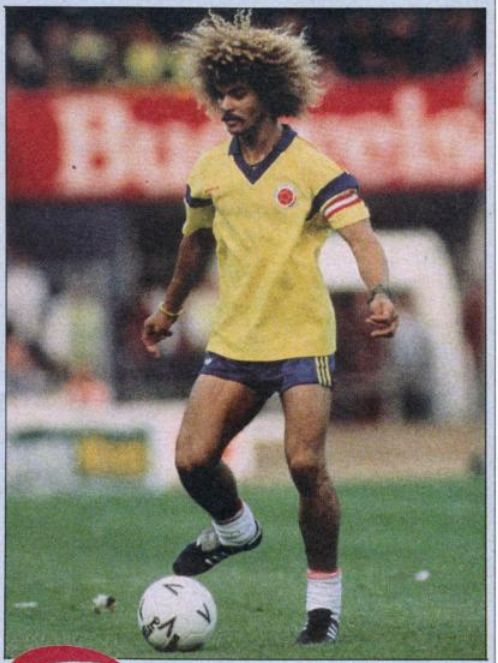

অন্যতম শিল্পী-ফুটবলার ভালদেররামা

বিশ্বকাপ ফুটবলে কেমন খেলবে আটটি দেশ

আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে খেলবে ২৪টি দেশ। এর মধ্যে সুইডেন, স্পেন, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, আয়ারল্যান্ড, মরক্কো, ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়া— এই আটটি দেশের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন **শৌনক ঘোষ**

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল কয়েকটা দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। খুব বড় মাপের কোনও 'স্টার' ছাড়াই ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
এ ছাড়া, এবার কোন দলের 'ফিফা কাপ' জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তা-ও বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। অর্থাৎ এককথায়, এবারের বিশ্বকাপে কোনও দলেরই একচ্ছত্র আধিপত্য থাকছে না। ফুটবলের দর্শকদের কাছে এটা একটা সুখবর বলা চলে। কেননা, এবার হবে জোর লড়াই। যে-কোনও অখ্যাত দলই এবার

অঘটন ঘটাতে পারে। যাঁদের প্রতিভা কম, তাঁরা দক্ষতার জোরে ম্যাচ জেতার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এবং এর ফলে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল যে রীতিমত জমে উঠবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন কয়েকটি দলের প্রস্তুতি ও পারফরম্যান্স সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।
সুইডেনের মিডফিল্ডার পার জেটারবার্গ খুব সম্ভাবনাময়। তাঁর বিশ্বাস, ফুটবলে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। যে-কোনও সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অপ্রত্যাশিত কিছু করে ফেলা যায়। 'হবে না' বলে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। তার উপযুক্ত প্রমাণও দিয়েছেন। ব্রাসেল্‌স-এর অ্যান্ডারলেকটে অনুষ্ঠিত একটি ম্যাচে (অসুস্থতা সত্ত্বেও) দুর্দান্ত খেলে চমকে দিয়েছিলেন দল-ম্যানেজার অ্যাড

ডেমোসকে। মজার ব্যাপার, ডেমোস গোড়ার দিকে জেটারবার্গকে দলে নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। মন্তব্য করে বলেছিলেন, "যা রোগা চেহারা, তাতে ওর পক্ষে ভাল ফুটবল খেলা অসম্ভব!"

জেটারবার্গের ফুটবল-জীবন নানা উত্থান-পতনের যোগফল। সুইডেনের কোনও ক্লাবে খেলার সুযোগ তিনি পেলেন না। অগত্যা বেলজিয়াম দলে যোগ দিলেন। এবং ফকেনবার্গ নামের এক অখ্যাত ক্লাবের হয়ে খেলতে লাগলেন। এটা ১৯৯০ সালের ঘটনা। এর পর পার চার্লেরয় ক্লাবে নাম লেখালেন। এবং এখানেই তাঁর কপাল খুলে গেল। একটানা দুর্দান্ত খেলে '৯৩-এর বর্ষসেরা বেলজিয়ান ফুটবলারের খেতাব লাভ করলেন। এর পর থেকে জেটারবার্গকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সুইডিশ দলের সব আশা তাঁকে ঘিরে, তাঁর মতো দক্ষ মিডফিল্ডার এখন সারা ইউরোপে খুব কমই আছেন।

স্পেন এবারের বিশ্বকাপে খুব ভাল খেলবে বলে মনে হয়। স্পেনের দখলে আছে অনেক তরুণ প্রতিভা। এ-ব্যাপারে দলকর্তা জেভিয়ার ক্লেমেন্টের প্রয়াস অসামান্য। তিনি বরাবরই তারুণ্য এবং প্রতিভার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সফলও হয়েছেন। কোয়ালিফাইং ম্যাচে সেবার স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল। খেলা শেষ হতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। খেলার ফলাফল পর্তুগাল ২, স্পেন ১। জেভিয়ার খুব উদ্বিগ্ন। নিজের দেশের মাটিতে পর্তুগালের কাছে তাঁর দল হেরে যাবে! হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে রেফারির মনোযোগ কাড়লেন। জুলিও সালিনাসকে মাঠের বাইরে ডেকে নিলেন। পরিবর্তে নামালেন ২১ বছরের স্ট্রাইকার জুয়ানিলি-কে। খেলা শেষ হতে আর দু' মিনিট বাকি। দর্শকরা আসন থেকে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ জুয়ানিলি বিদ্যুদ্বেগে গোল করলেন। স্পেন সে-যাত্রায় কোনওক্রমে বেঁচে গেল।

জুলিওকে স্পেনের প্রধান অস্ত্র বলা চলে। খুব বড় মাপের খেলোয়াড় তিনি। স্পেনের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল দিয়েছেন। আশা করা যায়, আমেরিকায় তিনি ভাল ফল করবেন।

আর-একজন ফুটবলারের কথা না বললে স্পেনের ফুটবল সম্বন্ধে পুরোপুরি বলা হয় না। তিনি হলেন সার্গি। বয়স ২২। খেলেন লেফ্‌ট ব্যাকের জায়গায়। সার্গি গোড়ার দিকে জুনিয়ার টিমে খেলতেন।

অ্যাসপ্রিল্লা

কলম্বিয়ার ফুটবল মানেই একমাথা ঝাঁকড়া সোনালি চুলের ভালদেররামার ছবি। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন অ্যাসপ্রিল্লা। তাঁর অসাধারণ ক্ষিপ্র গতি, বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, গোল করার দক্ষতা সকলের জানা। আশা করা যায় অ্যাসপ্রিল্লা এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখাবেন।

এখন স্পেনের বড় ক্লাবগুলির নিয়মিত খেলোয়াড়। এমনকী, এবারের বিশ্বকাপে জাতীয় দলে খেলার জন্য মনোনীত হয়েছেন। "এতদিন বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ হয়নি, তা আমার দুর্ভাগ্য। 'সময়' আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেনি।"

আক্ষেপের সঙ্গে সার্গি কথাগুলি জানিয়েছেন। তাঁকে ফুটবলের 'সব্যসাচী' বললেও বেশি বলা হবে না। দু' পায়েই দারুণ শট। নিখুঁত বল বাড়ানোর ক্ষমতা। সারা মাঠ জুড়ে খেলতে পারেন। চেহারায় কিছু কমতি (রোগা) থাকলেও মনোবলে কোনও ঘাটতি নেই। তবে বাঁ পা-টাই বেশি প্রিয়। মাঠের বাঁ দিকটা জুড়ে একাই দখল করে রাখেন সার্গি। বিশ্বকাপে ভাল খেলার ওপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

মারাদোনাকে বাদ দিয়ে আর্জেন্টিনা তো বটেই, এমনকী, বিশ্বফুটবলের আলোচনা সম্ভব নয়। এবারের বিশ্বকাপেও মারাদোনা খেলছেন। তবে কেমন খেলবেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আগের মতো আর 'ফিট' নেই। তবু এখনও যে বল-পায়ে মারাদোনাকে মাঠে দেখতে পাওয়া যাবে, এটাই একটা মস্ত ব্যাপার।

অবশ্য প্রাথমিক পর্বের ম্যাচগুলিতে মারাদোনা যথেষ্ট ভাল খেলেছেন। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে টেনে তোলার পেছনে তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি।

আর্জেন্টিনার আর-এক মিডফিল্ডার মাঝমাঠে ঝড় তুলতে পারেন। নাম ফার্নান্ডো রেডোন্ডো। দুর্ভাগ্যক্রমে গত বিশ্বকাপে খেলতে পাননি তিনি। অপরাধ, দলকর্তা বিলার্দোর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি এবং তার ফলে অধিনায়ক মারাদোনার অখুশি হওয়া। বিষয়টা ছিল এরকম: গত বিশ্বকাপের ঠিক আগে ফার্নান্ডোকে কয়েকটা 'ফ্রেন্ডলি ম্যাচ'-এ খেলার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি আপত্তি জানান। কারণ ঠিক ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলছিল। এবং

সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই খেলায় নাইজেরিয়া ৪

তাঁকে পরীক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

ফার্নান্ডো কি এবারের বিশ্বকাপে খেলবেন ? এখনও এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কলম্বিয়া ফুটবল-বিশ্বে অপরিচিত ছিল। কলম্বিয়াকে বিশ্বের মানুষের কাছে সুপরিচিত করিয়েছে সে-দেশের ফুটবল। আর কলম্বিয়ার ফুটবল মানেই একমাথা ঝাঁকড়া সোনালি চুলের ভালদেররামার ছবি। ভালদেররামা এখন ফর্মের তুঙ্গে। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আরও দুই দক্ষ ফুটবলার। তাঁরা হলেন ফস্টিনো অ্যাসপ্রিল্লা এবং মিগুয়েল অ্যাসপ্রিল্লা। এঁরা দু' ভাই। ফস্টিনো সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। আশা করা যায়, কলম্বিয়া এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখাবে। দলগতভাবে আয়ারল্যান্ডের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। জ্যাকি চার্লটন তাঁর দলে তরুণ খেলোয়াড়দের রাখার পক্ষপাতী। এর থেকে মনে হয়, তিনি অবশ্যই ক্রিশ কেলি-কে দলে নেবেন। কেলির বয়স মাত্র ১৯। কেলির সবচেয়ে বড় গুণ হল, তিনি সারা মাঠ জুড়ে খেলেন। তাঁর প্রতিটি শটে আছে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের ছাপ। আক্রমণ ও রক্ষণে সমান দক্ষ।

রিয়ান গিজস-এর মতো নামকরা স্ট্রাইকারকে ঠেকিয়ে দিতেও তাঁর জুড়ি নেই। আসন্ন বিশ্বকাপে অনেকের নজর থাকবে কেলির

ফ্রান্সোইস ওমান-বাইক

ওপর।

সম্প্রতি আফ্রিকার দেশগুলি ফুটবলে খুব উন্নতি করেছে। দারুণ হইচইয়ের মধ্য দিয়ে গত বছর অক্টোবরে শেষ হল যোগ্যতা বিচারের খেলা। এতে মেতে উঠেছিল আফ্রিকার ৩০টিরও বেশি দেশ। ১৯৯৩ সালে এপ্রিলে প্রাথমিক নির্বাচনে আফ্রিকার মোট ন'টি দল দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠে। এর ছ' মাস পর তিনটি দেশের সেরা তিনটি দল ১৯৯৪ বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। এরা হল, নাইজেরিয়ার 'সুপার ঈগলস' (গ্রুপ 'এ')। তারা হারায় 'কোট ডি আইভরি' ও আলজেরিয়াকে। মরক্কোর 'লায়নস অব অ্যাটলাস' (গ্রুপ 'বি')। তারা হারায় জাম্বিয়া ও সেনেগালকে। এবং ক্যামেরুনের 'ইন্ডামিটেবল লায়নস' (গ্রুপ 'সি')। তাদের কাছে পরাজিত হয় জিম্বাবোয়ে ও ঘানা।

আফ্রিকাবাসীদের কাছে ফুটবল এখন নিছক একটি খেলা নয়। একই সঙ্গে একতা, গর্ব ও জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তাই দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়া ছ'টি দেশে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছেন জাম্বিয়ার মানুষ। বিশ্বকাপে খেলার জন্য এত কঠোর পরিশ্রম আর কোনও দলই করেনি।

কলুশা বালিয়া, গিবি জুলু, এলিজাহ লিতানা, এঁরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত খেললেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মরক্কো তাঁদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে দেয়। 'ইতালিয়া নাইন্টি'-র পর থেকে ক্যামেরুন প্রতিটি দলের কাছে আতঙ্ক। গত বিশ্বকাপে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। তাও আবার অতিরিক্ত সময়ে। বেশিরভাগ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরাই এখন বয়স হয়ে গেছে। রজার মিল্লার মতো 'ম্যাজিশিয়ান ফুটবলার' এবারের বিশ্বকাপে খেলছেন না। তিনি এখন দল-পরিচালক। ইতালিতে মিল্লাকে সবরকমভাবে সাহায্য করেছিলেন সতীর্থ খেলোয়াড় ফ্রান্সোইস ওমান-বাইক। ওমান এবারের বিশ্বকাপে খেলবেন। ক্যামেরুনের প্রায় সবক'টি গোলেরই রূপকার তিনি। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে পর-পর দু'টি গোল করে দলকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তুলেছেন। সঙ্গে আছেন আর-এক স্ট্রাইকার কেশাক মাবোং। মরক্কো ও ক্যামেরুন বিশ্ব-ফুটবলে মোটামুটি পরিচিত। তারা এর আগে দু'বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে। কিন্তু নাইজেরিয়া বিদেশি টিমগুলির কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাদের খেলার ধরন সম্বন্ধে কোনও দলেরই বিশেষ কিছু জানা নেই। কারণ, এবারই প্রথম তারা বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা লাভ করল। হয়তো-বা এতে নাইজেরিয়ার সুবিধে হবে। তবে ঘরোয়া ফুটবলে নাইজেরিয়ার খুব নামডাক। ১৯৯০-এ তারা 'আফ্রিকান নেশনস কাপ' জিতেছে। এবং তাদের অনূর্ধ্ব সতেরোর দলটি দু'বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নাইজেরিয়ার জাতীয় দল ছ'টি ঘরোয়া ম্যাচে মোট ২২টি গোল করেছে। পরিবর্তে গোল খেয়েছে মাত্র একটি।

আফ্রিকায় যতগুলি প্রথম সারির ফুটবল টিম আছে, নাইজেরিয়া তাদের অন্যতম। রশিদি ইয়েকিনি এবং জর্জ ফিনিদি দু'জনেই দারুণ ফর্মে আছেন। দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়াও ভারী চমৎকার। তাঁদের কারও পায়ে বল পড়লে গোল আটকানো খুব মুশকিল।

আফ্রিকায় যতগুলি প্রথম সারির ফুটবল টিম আছে নাইজেরিয়া তাদের অন্যতম। রশিদি ইয়েকিনি এবং জর্জ ফিনিদি দু'জনেই দারুণ ফর্মে আছেন। দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়াও ভারী চমৎকার। তাঁদের কারও পায়ে বল পড়লে গোল আটকানো খুব মুশকিল।

ব্রাজিল ফুটবল-দল : ১৯৯০ ; এই দলের কতজন খেলোয়াড় এবার দলে থাকবেন

বিশ্বকাপ জিততে পারে ব্রাজিল

এবার বিশ্বকাপ জেতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে ব্রাজিল।
লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

ফুটবল-সম্রাট পেলে বেশ কিছুদিন আগে বলেছিলেন, "ব্রাজিল ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ জিততে পারবে কি না সন্দেহ। খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স হতাশজনক।" বিশ্বফুটবলের প্রবাদতুল্য নায়ক পেলে আবার সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, "এখন ব্রাজিলকে দেখে মনে হচ্ছে চতুর্থবার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য তারা প্রস্তুত। বেবেতো ও রোমারিওর ফর্ম খুব ভাল আছে।" পেলের ফুটবলজ্ঞান নিয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ব্রাজিল এবং পেলে একাত্ম হলেও পেলে ব্রাজিলের অন্ধ ভক্ত নন। ব্রাজিল ফুটবলসংস্থা এবং কোনও-কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর তিক্ত সম্পর্কের কথাও আমরা জানি। রোমারিও-র সঙ্গেই কিছুদিন আগে এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও রোমারিও-র দক্ষতার কথা বলতে ভুল করেননি পেলে। সুতরাং পেলের বক্তব্য ভেবে দেখার মতো। সবচেয়ে বড় কথা, ব্রাজিলের সাম্প্রতিক ফলাফল পেলের সপ্রশংস মন্তব্যের সঙ্গে মানানসই।

ব্রাজিল গতবার বিশ্বকাপে জিততে পারেনি। জিততে পারেনি তার আগের চারবারও। কিন্তু এবার, ২৪ বছর পর তারা দুর্দান্তভাবে তৈরি। দিনকয়েক আগে বিশ্বকাপের এক প্রস্তুতিম্যাচে ব্রাজিল প্রায় উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনাকে। দু' গোলে জিতলও তারা। দুটি গোলই করেন কুশলী ফরওয়ার্ড বেবেতো। দলে আছেন আক্রমণাত্মক আরও দুই বিশ্ববিখ্যাত স্ট্রাইকার বেবেতো এবং রোমারিও। বস্তুত, এখন যেরকম আক্রমণাত্মক খেলা ব্রাজিল খেলছে, বহুদিনের মধ্যে সেরকম দেখা যায়নি। ব্রাজিল তিনবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০) বিশ্বকাপ জিতে জুলে রিমে ট্রোফি বরাবরের মতো নিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু গত পাঁচটি

ব্রাজিলের সেরা স্ট্রাইকার রোমারিও

বিশ্বকাপে (১৯৭৪-১৯৯০) তাদের পারফরম্যান্স বলার মতো নয়। প্রতিটি বিশ্বকাপেই দলে ঐক্যের অভাব বড় হয়ে উঠেছিল, সর্বোপরি ব্রাজিল ফুটবলের যেটি সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক, শিল্পসমৃদ্ধ ছন্দোময় আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেওয়ার ক্ষমতা, তা একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না। কোচ লাজারোনির নির্দেশে গত বিশ্বকাপে অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে গিয়ে তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডের বাধাই অতিক্রম করতে পারেনি। এখনকার কোচ কার্লোস আলবার্তো পেরিরা আর সে-ভুলের ফাঁদে পা দেননি। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি ফিরিয়ে এনেছেন স্কিলনির্ভর আক্রমণাত্মক ফুটবল। এইজন্যই প্রি-বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিতে ব্রাজিল বেশ ভাল খেলতে পেরেছে। কোয়ালিফাইং গ্রুপ ম্যাচের প্রথম দুটিতে ইকুয়েডর ও বলিভিয়ার বিপক্ষে গোল করতে না পারলেও শেষের দিকের প্রায় সবক'টি ম্যাচেই ব্রাজিল জিতেছে পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে। দেশের মাটিতে ইকুয়েডরের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাজিলের প্রাধান্য এতটাই ছিল যে, গোলরক্ষক তাফারেলকে কোনও 'সেভ'-ই করতে হয়নি।

শুধু ট্যাকটিসের ক্ষেত্রেই নয়, দল নির্বাচনেও কোচ আলবার্তো পেরিরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েছেন, কোনও খেলোয়াড়কেই অপরিহার্য ভাবতে দেননি। এইজন্য বিশ্বখ্যাত রোমারিও বাজে খেলামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন, অভিজ্ঞ কারেকাকেও বাদ দিতে দ্বিধা করেননি তিনি। এর ফলে প্রত্যেকেই দলে জায়গা পাওয়ার জন্য সেরা খেলা খেলার চেষ্টা করছেন। এবং এইভাবে পেরিরা একটি উপযুক্ত সুসংহত দল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। দলে একদিকে যেমন আছেন অভিজ্ঞ ফুটবলার, অন্যদিকে তেমনই আছেন প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়। দলে যেমন আছেন বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ তাফারেল ও ব্রাঙ্কো, তেমনই আছেন এই প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া নবীন ফুটবলার কাফু এবং অধিনায়ক রাই।

ব্রাজিল দলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক তাফারেল আবার জাতীয় দলে ফিরে এসেছেন। গত বিশ্বকাপে তিনি যথেষ্ট ভালই খেলেছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপের পর ফর্ম হারানোয় তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয় কার্লোস রবার্তো গাল্লেকে। কিন্তু তিনি সেরকম পারফরম্যান্স না দেখাতে পারায় আবার ফিরিয়ে আনা হয়

ডিফেন্সে বড় ভূমিকা নেবেন ব্রাঙ্কো

ফিরে আসছেন গোলরক্ষক তাফারেল

তাফারেলকে। প্রাক্-বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিতে তাফারেল নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আশা করা যায়, ফাইনাল পর্যায়ে তিনি ভালই খেলবেন।

দক্ষ ফরওয়ার্ড হিসেবে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছেন বেবেতো। তিনি হেডিং-য়ে পারদর্শী, দু' পায়ে আছে প্রচণ্ড শট। প্রাক্-বিশ্বকাপের ম্যাচে তিনি দুর্দান্ত গোল করেছেন। ৩০ বছরের বেবেতোর ওপর এই বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের ভরসা অনেকখানি। ব্রাজিলকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে নিয়ে যাওয়ার অনেকখানি কৃতিত্ব সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার রোমারিও-র। তিনি উরুগুয়ের বিপক্ষে না জেতালে ব্রাজিল এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডেই ছাঁটাই হয়ে যেত। ইংল্যাণ্ডের গ্যারি লিনেকারের পর পেনাল্টি বক্সে এরকম বিপজ্জনক স্ট্রাইকার আর দেখাই যাচ্ছে না। স্প্যানিশ এবং ডাচ লিগে অসংখ্য গোল করেছেন রোমারিও। আন্তর্জাতিক ম্যাচেও তাঁর গোল কম নয়। এই বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বনায়ক হতে পারেন রোমারিও।

এই প্রথম বিশ্বকাপে খেলবেন ব্রাজিল দলের অধিনায়ক রাই। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ডি সুজা ভিয়েরা অলিভিয়েরার। অভিজ্ঞ কোচ তেলে সান্তানার মতে, এখন ব্রাজিল দলের সেরা ফুটবলার রাই। দাদা সক্রেটিসের মতোই তিনিও খেলেন মাঝমাঠে। খেলার স্টাইলও আক্রমণাত্মক। যদিও রাই এখন খুব একটা ভাল ফর্মে নেই, ব্রাজিলের কোচ পেরিরার মতে, বিশ্বকাপে রাই দক্ষতার প্রমাণ রাখবেনই। আর-একজনের ওপরও ব্রাজিলের কোচ ও সমর্থকদের খুব আশা। তিনি এডমাণ্ডো। অসম্ভব প্রতিভাবান স্ট্রাইকার। দুর্দান্ত জোরে দৌড়ে জায়গা নিতে পারেন, ড্রিবলিং-এ দক্ষতা অসাধারণ এবং গোল করার ইচ্ছাও প্রবল। রোমারিওর খুব পছন্দের খেলোয়াড় ২৩ বছরের এডমাণ্ডো। তাঁর একটিই দোষ। বদরাগী। ফলে সাসপেণ্ড হন মাঝে-মাঝেই। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এই বিশ্বকাপ এডমাণ্ডোরও হতে পারে। তরুণ রাইট ব্যাক কাফুও এখন ভাল ফর্মে আছেন। ভাল খেলছেন রিকার্ডো গোমস, পালহিনা এবং মুলার। অভিজ্ঞদের মধ্যে আছেন লেফট ব্যাক ব্রাঙ্কো এবং মাঝমাঠে পরিশ্রমী দুঙ্গা। এঁদের সবাইকে নিয়ে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয়ের জন্য তৈরি। ফুটবলারের দক্ষতা নিয়ে সমস্যা না থাকলেও ব্রাজিলকে অন্য অনেক অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছে। যেমন, অভ্যন্তরীণ সঙ্কট। ফুটবল সংস্থার সঙ্গে নামকরা ফুটবলারদের আর্থিক প্রাপ্তি নিয়ে সমস্যা বেঁধেছে। তবে এখন সেসব সমস্যা অধিকাংশই কেটে গেছে।

ব্রাজিলের কোচ কার্লোস পেরিরা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের গ্রুপকে বলেছেন, 'গ্রুপ অব ডেথ'। প্রকৃতপক্ষে ছ'টি গ্রুপে ব্রাজিলেরটি সবচেয়ে শক্ত। এই গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছে ১৯৯০-এর দুই কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট রাশিয়া ও ক্যামেরুন এবং ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের সেমি ফাইনালিস্ট সুইডেন। অর্থাৎ প্রথম ম্যাচ থেকেই ব্রাজিল কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়বে। কিন্তু ব্রাজিল এসব সমস্যা অতিক্রম করতে পারবে বলেই তাঁদের কোচ বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে, সবার সেরা হয়েই ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতে নিতে পারবে।

সেই ছেলেটা

রমেন দাস

সেদিন বিকেলে গোবিন্দ এসে হাজির। শনিবার ছিল। পরের দিন রবিবার। সোমবারও কিসের যেন ছুটি ছিল। একটানা তিনদিন ছুটি। গোবিন্দ কথায়-কথায় বলল, "চল, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক।"

বললাম, "কাছাকাছি বলতে কোথায় ?"

"বিরামপুর।" একটুও দেরি না করে গোবিন্দ উত্তর দিল। বলল, "ওখানে আমার পিসেমশাই থাকেন। নদীয়া জেলার একপ্রান্তে শান্ত একটি গ্রাম। সামান্য কয়েক ঘর মানুষের বাস। গ্রামের মাঝখান দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে একটি আধমজা নদী। নদীর নাম মরালী।"

মরালী ! বেশ কাব্যিক নাম তো ! নদীর অমন সুন্দর নাম শুনে বললাম, "কই, আগে তো কখনও এই নদীর নাম শুনিনি !"

গোবিন্দ একটু বাঁকা হাসি হাসল। তারপর স্বভাবসুলভ শান্ত স্বরে বলল, "এরকম কত কিছুই তো ছড়িয়েছিটিয়ে আছে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। আমরা শহুরে মানুষ, তার কতটুকু খবর রাখি ?"

গোবিন্দর কথার উত্তর দেওয়ার জো ছিল না। ঠিকই তো, শুধু মরালী নদী কেন, কত অজানা খাল-বিল, নদী-নালা ছড়িয়ে আছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। কত গ্রামে পোড়ো মন্দির, মসজিদ, মঠ, অতীতের নীরব ইতিহাস বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তার কতটুকুই বা খোঁজ রাখি !

গোবিন্দ আমার বাল্যবন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই এককথার মানুষ। আমার মা-বাবা ওকে খুব ভালবাসেন। কথা বলে কম, শোনে বেশি। ওই কম কথাই এমন সরলভাবে বলে যে, শুনে না হেসে পারা যায় না। রাগ বলতে যা বোঝায় ওর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র নেই। সময় পেলেই বইয়ে ডুবে থাকা। দু-একদিনের ছুটি পেলে তো কথাই নেই। কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা।

গোবিন্দর প্রস্তাব শুনে মা অনুমতি দিলেন। মায়ের অনুমতি দেওয়ার কারণ শুধু বিরামপুর-ভ্রমণ নয়, ওই গ্রামের কাছাকাছি এক গ্রামে দাদা থাকেন। দাদার বাড়িও যেন ঘুরে আসি।

আর দেরি নয়। দু' বন্ধু পড়ন্ত বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম। শেয়ালদা স্টেশন থেকে রানাঘাট লোকাল ধরে চাকদা স্টেশন। চাকদায় যখন নামলাম, সবে সন্ধে নেমেছে। চারদিকে হালকা অন্ধকার। দেখি টিপটিপ বৃষ্টিও পড়ছে। প্রায় আধভেজা হয়ে দুই বন্ধু ছুটে গিয়ে একটি বাসে চাপলাম। গোবিন্দ বলল, "এ-বাস চাকদা থেকে বনগাঁ যাবে। সিলিন্দা স্টপে নামতে হবে। পিসেমশাইয়ের বাড়ি সেখান থেকে হাঁটা পথে মাইলতিনেক।"

শীতকাল নয়। ভরা ভাদ্র মাস। বৃষ্টিভেজা জামাকাপড়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। বাস ছাড়তে তখনও দেরি। তাই সময় কাটাতে গোবিন্দ বাদাম কিনল। গল্প করতে-করতে বাদাম খাওয়া শুরু করলাম।

বাসভর্তি মানুষ। গাদাগাদি ভিড়। কন্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলেন। আমরা সিলিন্দার দুটো টিকিট চাইলাম। ভিড় সরিয়ে এক যুবক আমাদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "সিলিন্দায় কোন বাড়ি যাবেন ?"

যুবকের গায়েপড়া প্রশ্নে আমি বিরক্ত হলাম। কিন্তু গোবিন্দ শান্তভাবে জবাব দিল, "সিলিন্দা নয়, ওখানে নেমে বিরামপুর যাব। চিত্ত ডাক্তারের বাড়ি। তিনি আমার পিসেমশাই।"

লোকটা এবার আরও এগিয়ে এল। গলা বাড়িয়ে একটু হেসে বলল, "ভালই হল। আমিও ও-পথে যাব।" নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম ফেলুরাম কীর্তনীয়া। পাঁচ গাঁয়ের সবাই আমাকে চেনে। তবে ফেলুরাম নয়, আমাকে সকলে ফ্যালনা বলে ডাকে।"

ছিপছিপে, লম্বা। ধুতির সঙ্গে শার্ট পরা। বড়-বড় চুল। দেখতে অনেকটা যাত্রাদলের অধিকারীর মতো। একটু আগে ওর গায়েপড়া ভাব দেখে বিরক্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু ওর সরল-সহজ ভাব আমাদের মুগ্ধ করল। দেখলাম, বাসের প্রায় সব যাত্রীই ওকে চেনে।

সিলিন্দা বাস স্টপে নেমে দেখি, চারদিকে

ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গোবিন্দ বুদ্ধি করে একটি টর্চ এনেছিল। সেটা বের করতেই ফ্যালনা বলল, "আপনারা শহুরে মানুষ। লাইটের আলো ছাড়া আপনারা অন্ধকারে চলতে পারেন না। আমরা অন্ধকারেই হাঁটাচলা করতে অভ্যস্ত। আজ অমাবস্যার রাত। ঘন অন্ধকার। টর্চটা এনে ভালই করেছেন। এটা আজ বেশ কাজ দেবে।"

"অমাবস্যা ?" ফ্যালনার কথা শুনে চমকে উঠলাম। এটা তো ভাদ্র মাস। দিদিমার মুখে শুনেছিলাম, ভাদ্র মাসের অমাবস্যা নাকি ভীষণ ভয়ঙ্কর। এ-রাতে দৈত্যদানব, ভূতপ্রেত সব ঘুরে বেড়ায়। ভয়ে আমরা দু'জনেই দু'জনের কাছাকাছি হলাম। ফ্যালনা বোধ হয় আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারল। কিছুটা অভয়ের সুরে বলল, "অমাবস্যা আর পূর্ণিমা, ওই একই হল। অন্ধকার আর আলো। যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন ! দিনে আর রাতে কোনও তফাত নেই। এ-অঞ্চলে ভয়ডরের কোনও কারণ নেই।" বিজ্ঞের হাসি হাসল সে।

পাকা পথ ছেড়ে আমরা ধান আর পাটখেতের আলপথ ধরলাম। সামনে টর্চ হাতে দ্রুত এগোচ্ছে ফ্যালনা। পেছন-পেছন আমি আর গোবিন্দ। সেই ছোটবেলায় কবে বাবার সঙ্গে গোবিন্দ বিরামপুর এসেছিল ! পথঘাট অনেক পালটে গেছে। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার। দূরে একটা হ্যাজাক লাইট জ্বলতে দেখে ফ্যালনা হাঁক দিল, "ওখানে কী হয়েছে রে ? আমি ফ্যালনা বলছি।"

ফ্যালনার হাঁক শুনে ওদিক থেকে সমবেত ধ্বনি ভেসে এল, "তাড়াতাড়ি চলে আয় ফ্যালনা, বিশাল একটা কালনাগিনী মেরেছি।" ধান আর পাটখেতের আলপথে ভেজা জামা-কাপড়ে আমরা ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল, ওই পথের আশপাশে কত কালনাগিনী যে কিলবিল করছে। অজানা আশঙ্কা আর আতঙ্কে আমরা প্রায় দিশাহারা। গোবিন্দ বলল, "বাবার কাছে শুনেছি, অমাবস্যায় নাকি সাপের বিষ বাড়ে !"

ফ্যালনা বীরের হাসি হাসল। আমাদের আশঙ্কা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "ভয় পেলেই ভয়। সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে দেখবে সব ভোঁ। এ-অঞ্চলে ভয়ডর, শঙ্কার কোনও কারণ নেই।"

ফ্যালনার সঙ্গে আমরা দু'জন গিয়ে হাজির হলাম সাপ মারার জটলায়। হ্যাজাকের আলো। সকলের হাতে লাঠি। জোড়া-জোড়া চোখ আমাদের দিকে। আমরা ওদের কাছে অপরিচিত। ফ্যালনা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, "আমার বন্ধু ওরা। কলকাতা থেকে এসেছে।" তারপরই ফ্যালনা আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "চারভাগের তিনভাগ পথ তোমরা এসে গেছ। আর মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই বিরামপুরে চিত্ত ডাক্তারের বাড়ি। কোনও ভয় নেই। পথে কেউ কিছু জানতে চাইলে বলবে, আমরা ফ্যালনার বন্ধু, চিত্ত ডাক্তারের বাড়ি যাব।..."

একটা মেঠো পথ দেখিয়ে ফ্যালনা বলল, "কিছুটা এগোলে দেখবে পথটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকে বাঁক নিলেই বিশাল এক বাঁশঝাড়। সেখান থেকে সোজা হাঁটলেই চিত্ত ডাক্তারের বাড়ি।"

ফ্যালনা আমাদের বিদায় দিল। হ্যাজাক লাইটের আলো ছেড়ে এগোতে অন্ধকার পথ আরও বেশি অন্ধকার মনে হল। কিছুই দেখা যায় না। কিছুটা এগনোর পর গোবিন্দের খেয়াল হল, হাতের টর্চটা নেই। ভুল করে সেটা ফ্যালনার হাতে রয়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকার পথে আমরা বেশ বিপদে পড়লাম। আমি থমকে দাঁড়ালাম। বিদঘুটে অন্ধকার। নিজেদের ভারী অসহায় মনে হল। গোবিন্দ বলল, "যা হয় হবে। চল তো এগিয়ে যাই।"

গোবিন্দ আমার চেয়ে অনেক বেশি সাহসী। কিছুটা একরোখাও। বুঝলাম, এবার ওর জেদ চেপেছে। ভয়ডর তুচ্ছ করে এগোবেই। আমি শক্ত করে ওর হাত ধরলাম। দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সামনে একটা বাঁশঝাড় পড়ল। বুঝলাম, ফ্যালনার নির্দেশিত পথ ধরেই এগোচ্ছি। নিঝুম, নিঃশব্দ। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বৃষ্টিতে মাটির পথ ভিজে কাদা হয়ে গেছে। একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ার আশঙ্কা। তাই খুব সাবধানে এগোচ্ছি।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ। আমরা চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম। সারা শরীর যেন অসাড় মনে হল। গোবিন্দ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ওটা একটা পাখির ডাক। সম্ভবত কোরাল পাখিটাখি হবে।

বাবার মুখে এই পাখির নাম শুনেছি। পাড়াগাঁয়ে কোরাল পাখি থাকে। রাতবিরেতে এদের কর্কশ ডাকে মানুষ ভয় পায়।"

গোবিন্দর কথা শেষ হতে না হতেই দেখি, আমাদের বয়সী একটা ছেলে এগিয়ে আসছে। ঘন অন্ধকার। সবকিছু অস্পষ্ট। দূর থেকে ছেলেটিকে দেখে কিছুটা ভরসা পেলাম। আমার মা কথায়-কথায় বলতেন, "বিপদআপদ যেখানে, বিপত্তারিণীও সেখানে। বিপদে পড়লে তিনিই উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। দূরে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে মায়ের সেই আপ্তবাক্য মনে পড়ল।

গোবিন্দ বলল, "যাক, ভালই হল। ঘুটঘুটে এই অচেনা অন্ধকার পথে ওই ছেলেটি হয়তো আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে।" আমরা বেশ ভরসা পেলাম।

গোবিন্দ প্রশ্ন করল, "কে তুমি ভাই? চিত্তডাক্তারের বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দেবে?"

অচেনা ছেলেটা গোবিন্দর ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, "সামনে কিছু পথ গিয়ে বড় একটা তেঁতুলগাছ দেখবে, তার পাশেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাবুর বাড়ি চেনাতে ছেলেটি ফিরে এগোতে লাগল। আমি আর গোবিন্দ তার পিছু-পিছু। গাঢ় অন্ধকারে ছেলেটির মুখ চেনার উপায় নেই। ছেলেটিও চুপচাপ এগিয়ে চলল। ফিসফিস করে গোবিন্দ বলল, "বরাত আমাদের ভালই। না হলে অসময়ে এ-অন্ধকারে এমন একজন পথিক বন্ধু পাব কেন?"

কিছুটা হাঁটার পর গোবিন্দ কৃতজ্ঞতার সুরে জানতে চাইল, "তোমার নাম কী ভাই?"

আমাদের আগে-আগে হাঁটা অচেনা বন্ধুটি উত্তর দিল, "আমি আর এখন এ-গ্রামে থাকি না। আমাকে কেউ চিনতে পারবে না।" সংক্ষিপ্ত এই উত্তর দিয়েই ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আঙুল উঁচিয়ে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওটাই ডাক্তারবাবুর বাড়ি।"

ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ডাক্তারবাবুর বাড়ি গিয়ে ঢুকলাম। গোবিন্দকে পেয়ে পিসিমা-পিসেমশাই জড়িয়ে ধরলেন। পাশের ঘর থেকে ভাইবোনেরা ছুটে এল। গোবিন্দ আমার পরিচয় করিয়ে দিল। মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। হারিকেনের আলোয় ওদের হাস্যোজ্জ্বল মুখের অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি দূর হল।

খিদেয় আমাদের পেট জ্বলছিল। পিসিমা সাততাড়াতাড়ি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমরা দু' বন্ধু খেতে বসলাম। আমাদের ঘিরে বাড়ির অন্যান্যরা। তার মধ্যে পিসেমশাইকে বেশ চিন্তিত মনে হল। নানা কথার শেষে তাঁর প্রশ্ন, "বৃষ্টিভেজা এই অন্ধকার রাতে প্রায়-অচেনা পথে তোমরা এলে কী করে?"

গোবিন্দ আমাদের সারা পথের বিবরণ দিয়ে বলল, "ফ্যাল্‌নাকে না পেলে পথ চিনে আমরা এখানে এই রাতে আসতে পারতাম না।"

অবাক পিসেমশাইয়ের আবার প্রশ্ন, "ফ্যাল্‌নাকেও তোমরা চিনে ফেলেছ? ভারী উপকারী ছেলে। কেউ কোথাও বিপদে পড়লে ফ্যাল্‌না সেখানে হাজির। এ-যুগে ওই ধরনের ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। ফ্যাল্‌না নিশ্চয়ই তোমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে?"

গোবিন্দ বলল, "ফ্যাল্‌না অবশ্য শেষ পর্যন্ত আসেনি। বুড়ো শিবতলা পর্যন্ত সঙ্গে এসে আমাদের পথের নিশানা দেখিয়ে দিয়েছে। ওর নির্দেশমতো বাঁশঝাড় পর্যন্ত সরাসরি চলে আসি। অন্ধকার ছাড়া আর কোনও অসুবিধে হয়নি। ওখানটায় এসে আমরা পথ হারাতে বসেছিলাম। একটু ভয়-ভয়ও করছিল। আমাদের বরাত ভাল, ঠিক সেই সময় একটা ছেলে এগিয়ে এল। সে-ই আমাদের বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে গেল।"

গোবিন্দর কথা শুনে পিসেমশাই সহ বাড়ির সকলেই প্রায় আঁতকে উঠলেন। ওঁদের চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল। পিসেমশাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "জানো গোবিন্দ, যে-ছেলেটা তোমাদের আমার বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে, রাতবিরেতে কেউ আমাকে খুঁজতে এলে, সে তাদের আমার বাড়ি চিনিয়ে দেয়। সকলেই ছেলেটিকে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখে। কিন্তু আমি আজও ছেলেটির দেখা পাইনি। লোকমুখে ওর কথা শুনি।"

পিসেমশাই কেমন যেন একটু আনমনা হলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, "আমাদের এ-গাঁয়ে এক গরিব বিধবা ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে। বিধবা একবার খুব অসুখে পড়ল। গরিব মানুষ। টাকা-পয়সা নেই। তার অসহায় ছেলেটি ছুটে এল। কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। বলল, 'ডাক্তারবাবু, খাওয়া জোটে না, মা'র অসুখ। তাঁকে বাঁচাব কী করে?' ছুটে গেলাম ছেলেটির সঙ্গে। চিকিৎসা করালাম। ওষুধপত্রও কিনে দিলাম। কিন্তু তাকে আর বাঁচাতে পারলাম না।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন চিত্ত ডাক্তার। তারপর আবার কিছুক্ষণ উদাসীন চোখে কী যেন ভাবলেন। বললেন, "মাতৃহারা ওই ছেলেটার কী দুর্দশা! অভাব-অনটনে কোনওরকমে দিন কাটাত। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে সে একবার আসত, আমায় প্রণাম করত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলত, 'ডাক্তারবাবু, আমার ভাগ্য খারাপ, তাই মা'কে ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু আপনার চেষ্টার তো কোনও ত্রুটি ছিল না।'"

কথা বলতে-বলতে পিসেমশাইয়ের গলা ভারী হয়ে গেল। চোখের কোণও ছলছল করে উঠল। তারপর আপনমনেই আবার বলে চললেন, "গরিব ঘরের ছেলে। কিন্তু অমন মা-পাগল ছেলে আগে কখনও দেখিনি। তারপর একদিন শুনলাম, ওই ছেলেটাও মারা গেছে।"

ভাতের থালা সামনে রেখে আমি আর গোবিন্দ পিসেমশাইয়ের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিলাম। পিসিমা একটু কড়া ধাঁচের মানুষ। পিসেমশাইকে বললেন, "এবার থামো তো। এই রাতে ওদের আর মরার গল্প শোনাতে হবে না। ওরা শহুরের ছেলে। দু-চারদিনের জন্য গ্রামেগঞ্জে বেড়াতে এসেছে। এসব শুনলে ওদের ভয় করবে না?"

পিসেমশাই শান্ত স্বভাবের মানুষ। আরও শান্তভাবে বললেন, "ভয়ের কী আছে? যা সত্য, তাই তো আমি বলছি!"

গোবিন্দর প্রশ্ন, "যে-ছেলেটা আমাদের এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে দিল, বলল সে এ-গাঁয়ে এখন আর থাকে না। অথচ তোমাদের বাড়ি চেনে, এই ছেলেটা কে?"

পিসেমশাই চশমা খুলে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলেন। বললেন, "শুনেছি রাতবিরেতে অচেনা কেউ এলে ছেলেটাই আমার বাড়ি চিনিয়ে দেয়। তারপর অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওই বাঁশবন, আমার বাড়ি, এইটুকু পথের মধ্যেও নাকি সকলে ওর দেখা পায়।"

আমার মতো গোবিন্দর চোখেও এবার আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। মনে-মনে ভাবলাম, 'তা হলে কি সেই ছেলেটাই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখিয়েছিল? বাঁশঝাড়ের কাছেই তো তার সঙ্গে আমাদের দেখা।' আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি বোবা চোখে গোবিন্দর দিকে তাকালাম। গোবিন্দ আমার দিকে।

ছবি : অনুপ রায়

শারদীয়া

পাপি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বাদলার দিনে আকাশটা যেন মুখ ভার করে নীচের দিকে নেমে এসেছিল। দু'দিন থেকে নাগাড়ে বৃষ্টির পর অবিরল ধারাটা একটু ধরলেও চারদিক কেমন যেন থমকে রয়েছে আবার বর্ষণের আশঙ্কায়। দিনের বেলাও অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। আজ অলি, তুলির স্কুল হয়নি, 'রেনি ডে' হয়ে গেছে। স্কুলের জামা জলে ভিজে সপসপে, জুতোর অবস্থাও সেইরকমই। বাড়ি ফিরে এসে গরম-গরম খিচুড়ি আর বেগুনি খাওয়ার পর ওরা দু'জনেই মাকে ধরে বসেছে একটা গল্প বলতেই হবে। আর যেমন-তেমন গল্প নয়, আজকে এই বাদলার দিনে একটা ভূতের গল্প শুনতে চায় ওরা, যা শুনলে দিনের আলোতেও গা ছমছম করবে। মা সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ভাবছিলেন একটু ঘুমিয়ে নেবেন, কিন্তু অলি, তুলি কি সে-কথা শুনবে! তার ওপর মজাটা হয়েছে, দু'দিন ধরে দুই মাসির দুই মেয়ে তিতলি আর চিকুলিও তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে গেছে। অলি, তুলিরাও তাদের দু'দিন ধরে বাড়ি ফিরে যেতে দেয়নি। ওরা যখন অলি, তুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবদার ধরল, "ও মাসিমণি, ভূতের গল্প বলো, সত্যিকারের ভূতের গল্প," তখন আর মা না বলেন কী করে।

মা বলতে শুরু করলেন, "আচ্ছা, আমি একটা ভূতের গল্প বলছি যেটা শুনেছি তোদের দিদার কাছে। এটা দিদার ছেলেবেলার গল্প। তোরা তো আমার কাছে শুনেছিস আগেই, তোদের দিদা ছেলেবেলায় থাকতেন বেরেলিতে। সেখানেই থাকতেন তাঁর বাবা-মা। বাবা-মায়ের আদরে খুব আনন্দে কেটে যেত তাঁর দিনগুলো। "আমার দাদু ছিলেন সেখানকার একটা বিরাট দেশলাই কারখানার জেনারেল ম্যানেজার। বিশাল বাগানওলা বাড়ি, অনেক কাজের লোকজন, এমনকী তখনকার দিনে দাদুর একটা মোটরগাড়িও ছিল। মা যখন যা আবদার করতেন, তাই পেতেন। কিন্তু আমার দাদু ও দিদার ভাবনা হল তোদের দিদার পড়াশোনা নিয়ে। বেরেলিতে স্কুল থাকলেও সেখানে তো বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা নেই, আর মেয়েকে বাংলা শেখাবেন না এ-কথা আমার দাদু, দিদিমা চিন্তাও করতে পারতেন না। দাদু তো সুদূর বেরেলিতে থেকেও ডাকযোগে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই আনাতেন কলকাতা থেকে। দিদিমাও সেইসব বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। দাদু বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এলে সন্ধেবেলা দু'জনে একসঙ্গে বসে পড়তেন বাংলা বই। কাজেই তোদের দিদা একটু বড় হতেই তাঁরা ঠিক করলেন তাঁকে ইলাহাবাদের স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। সেখানে বাংলার চর্চা আছে। বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয় তো ছিল খুবই নামকরা। যেসব জায়গায় বাংলা পড়ার ব্যবস্থা নেই সেসব জায়গার মেয়েদের অভিভাবকরা বকুলবাসিনীর হস্টেলে পাঠিয়ে দিতেন পড়াশোনার জন্য। হস্টেলের ব্যবস্থা ভাল ছিল, পড়ালেখাও ভাল হত, সেইসঙ্গে মেয়েরা বাংলাও শিখত।

"এদিকে তোদের দিদার তো কী কান্না, বাবা-মাকে ছেড়ে থাকবার কথা তো তিনি ভাবতেই পারতেন না! দাদু, দিদিমারও খুব মনখারাপ। তাঁরাও লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে মেয়েকে বাংলা শেখানোর ব্যাপারটা সবচেয়ে আগে। কাজেই মন শক্ত করে তাঁরা তোদের দিদা অর্থাৎ আমার মাকে ইলাহাবাদে বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে মা থাকতে লাগলেন হস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে। হস্টেলটা ঠিক অন্য পাঁচটা হস্টেলের মতো ছিল না, সব মিলিয়ে ছিল একটা

ঘরোয়া ভাব। ছিল নানা বয়সের মেয়েরা ; কেউ এসেছে জব্বলপুর থেকে, কেউ বা মিরাট থেকে, কেউ-বা গোয়ালিয়র থেকে। হস্টেল দেখাশোনা করেন একজন মাসিমা, আর আছেন স্নেহময়ী নিত্যপ্রিয়াদি। সকলের প্রতি তাঁর এত যত্ন, এত প্রখর মনোযোগ যে, কোনও কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। রবিবার সকালে আসেন স্বাস্থ্যদিদিমণি সুশীলাদি। তিনি বাংলা জানেন না। তাঁর নিয়মকানুন কড়া ধরনের। ছোট-বড় সকলকেই লাইন করে দাঁড়াতে হয়। সুশীলাদি এসেই মিলিটারি কায়দায় হাঁক পাড়েন, 'নাখুন কি সফাই কে লিয়ে হাত উপর।' অমনই সকলে দু' হাতের পাতা উলটো করে উঁচুতে ধরে রাখে। সুশীলাদি কড়া চোখে তাকিয়ে দেখেন কার নখ অপরিষ্কার। সুশীলাদি খাতায় নোট করে নেন। তিনি চলে যাওয়ার আগে নেলকাটার দিয়ে নখ কেটে তাঁকে দেখাতে হয়— হাত আর অপরিষ্কার নেই। এইরকমই ব্যাপার হয় দাঁতের ক্ষেত্রে, এমনকী, অনেক সময় চুলের ব্যাপারেও।

"এইভাবেই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দিদার আর ততটা মনখারাপ লাগছিল না, বিশেষত অতজন সঙ্গী তিনি কখনওই পাননি, বেরেলির বাড়িতে তাঁর একলা সময় কাটত। এর ওপর আবার ছিল হস্টেলের মেয়েদের বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম। কোনও রবিবারে চড়ুইভাতি হত খুসরুবাগের পেয়ারাবাগানে। শীতকালে সেখানে কত বড়-বড় গোলাপ আর গাছে-গাছে সাদার ওপর লালচে ছিট দেওয়া মিষ্টি পেয়ারা। বাগানরক্ষককে বুড়দিদিমণি পৃথাদি বলেই রাখতেন মেয়েরা ইচ্ছেমতো পেয়ারা পেড়ে খাবে গাছ থেকে। পরে হিসেব করে দাম দেওয়া হবে।

"কোনওদিন-বা নৌকো চড়ে চলে যাওয়া হত ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও লুপ্তধারা সরস্বতী এসে মিশেছে। সরস্বতী ঘাটের পাশে গভীর যমুনার জলের ওপর এসে পড়েছে সম্রাট আকবরের তৈরি দুর্গের ছায়া, ওপাশে মাঘমেলার সাধুসন্তদের ভিড়। দিদা ক্রমশই অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন হস্টেলের জীবনের সঙ্গে। সবচেয়ে আনন্দ হত বড়দিদিমণি পৃথাদি যখন প্রত্যেকের জন্মদিন ঠিক-ঠিক মনে রেখে জন্মদিনের কার্ড ও ছোট-ছোট উপহার পাঠাতেন। পৃথাদি থাকতেন হস্টেলের কম্পাউণ্ডের পাশের একটি খুব পুরনো আমলের বাড়িতে। স্কুলটা তাঁর বাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পৃথাদির যত্নেই স্কুলটার এত নামডাক হয়েছিল।

"গরমের ছুটি হত দীর্ঘ দু' মাসের। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে যেত। দিদাও বাড়ি গিয়ে দু' মাস ধরে দুপুরবেলা খসখসের পরদা ঘেরা ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে, গল্পের বই পড়ে এবং রাত্তিরে বাড়ির লনে চাঁদের আলোয় চারপাইয়ে পাতা বিছানায় শুয়ে আর তরমুজের শরবত ও কুলফি মালাই খেয়ে আরাম করতেন। তারপর জুলাই মাসে আবার ইলাহাবাদের বকুলবাসিনীর হস্টেল। গোলমালটা বাধল ঠিক তখনই। সাধারণত এই সময়ে এত বৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু বৃষ্টি চলল দিনে রাতে নাগাড়ে সাতদিন। হস্টেলটা ছিল একটা একতলা বাড়ি। ছাত থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে দিদাদের বিছানা ভিজে যেতে লাগল। আলকাতরা, পিচের চট, সিমেন্টের প্রলেপ সবই ধুয়ে যেতে লাগল বৃষ্টির তোড়ে। তখন উপায় বের করলেন পৃথাদি। বললেন, 'আমার বাড়ির একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। হস্টেলের মেয়েরা ওখানেই থাকবে বর্ষাকালটা। তারপর বৃষ্টি ধরলে, ছাত সারাই

RADEUS/SB/837/2-93-BEN

মশা ?

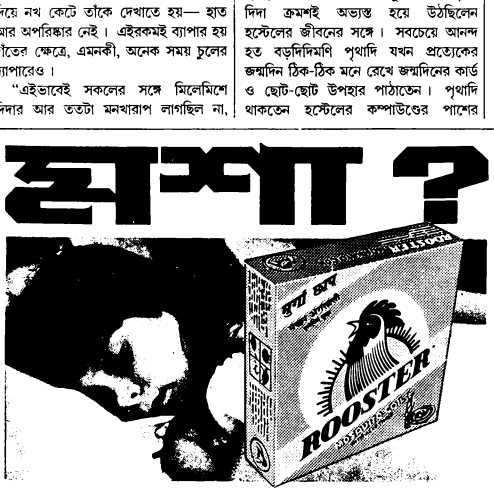

আপনার রাতের সুনিদ্রা নিশ্চিত করতে আনুন

রুস্টার

অ্যালেথ্রিন যুক্ত মশার ধূপ

উৎপাদক :
সান-আপ বোটানিক্স প্রা : লি :
৭৮৮/১, জি.আই.ডি.সি., ভাপি, গুজরাট

হলে আবার হস্টেলে ফিরে যাবে।' দিদারা তো সকলে দল বেঁধে চলে গেলেন পাশের কম্পাউন্ডে পৃথাদির বাড়ি। পুরনো আমলের বাড়ি, সামনে গাড়িবারান্দা, চারপাশের কম্পাউন্ড ঘিরে পাঁচিল।

"দিনের বেলাটা তো স্কুলেই কেটে যেত, বিকেলবেলা সবাই এসে জড়ো হত পৃথাদির বাড়ির একতলার বিরাট বড় হলঘরে। সেখানে সারি-সারি খাট পাতা, মেয়েরা সেই ঘরেই শোয়। বর্ষার রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যেত তাড়াতাড়ি। সকলেই যে যার খাটে বসে বই পড়ত। একসময় সকলেরই চোখ ঢুলে আসত ঘুমে। কেউ আগে, কেউ-বা একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ত। মাসিমা এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যেতেন। প্রথম দু-এক রাত দিদার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি। তৃতীয় দিন একটা কুকুরের একটানা ঘেউ-ঘেউ ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের খাটে দীপালিরও ঘুম ভেঙেছে বোঝা গেল। ঘুম ভেঙেছে রূপারও। দিদা শুনলেন দীপালি আর রূপা বলাবলি করছে, 'রোজ রাত্তিরে কুকুরের ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঠিক ঘরের বাইরেই ডাকছে। দিনের বেলায় তো কোনও কুকুর দেখি না এখানে! পৃথাদির তো কোনও পোষা কুকুর নেই।' দিদার যেন কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। এমন সময় জানলার পাশের খাটে শুয়ে থাকা বাণী হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, কে যেন তার বুকের ওপর চেপে বসেছে, উঠছে না কিছুতেই। দীপালি সকলের চেয়ে একটু বড়। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। কেউ কোথাও নেই। যে যার খাটে যে যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবেই শুয়ে আছে। কেউ বলল, হজম হয়নি তাই বুকচাপা হয়েছে, কেউ বলল সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস আটকে গেছে। বাণী কিন্তু আর জানলার ধারের খাটে শুতে রাজি হল না। দীপালির খাটে এসে দীপালির হাত জড়িয়ে ধরে তবেই ঘুমোল। দিদার তো সারারাত আর অস্বস্তিতে ঘুমই এল না, শুধু এপাশ আর ওপাশ করলেন।

"পরের রাত্তিরে মেয়েরা যে যার খাটে শুয়ে ছিল। সকলেই যেন উৎকর্ণ হয়ে আছে কুকুরের ডাক শোনবার অপেক্ষায়। এর মধ্যে মিনতির আবার একটু টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। টয়লেট থেকেই ওর তীব্র চিৎকার শোনা গেল। দীপালি, রূপা আর অন্য মেয়েরাও ছুটে গেল সেদিকে। জানলা দিয়ে অস্পষ্ট তারার আলোয় যেন দেখা গেল একটা লাল শাড়ি

পরা মেয়ে, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, হাতে চেনে বাঁধা একটা কুকুর, মিশে যাচ্ছে অন্ধকারের গভীরে। কুকুরের অস্পষ্ট ডাক শোনা যাচ্ছে, ঘেউ-ঘেউ...।

"মিনতি হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'ওই মেয়েটা! তার চোখ দুটো অন্ধকারে ধকধক করে জ্বলছে, যেন কুকুর নিয়ে তার বুকে চেপে বসতে চাইছিল।' এই কথাক'টা বলে মিনতি যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। কাঁপছিল।

"গোলমাল শুনে পৃথাদি দোতলা থেকে নেমে এলেন। সব শুনে কিন্তু মেয়েদের ভীরু বলে উপহাস করলেন না। বরং বললেন, 'সব ঠিকই তো মিলে যাচ্ছে। তোমরা যে বর্ণনা দিচ্ছ, তা ঠিক আমার বোন বকুলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তার নামেই হয়েছে আমাদের এই 'বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়'। তার পোষা কুকুরের নাম ছিল 'পপি'। লাল শাড়ি ছিল বকুলের খুব প্রিয়। রোজ বিকেল থেকে সন্ধে অবধি সে লাল শাড়ি পরে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল খুলে ঘুরে বেড়াত পপিকে নিয়ে। সেই পপিই একদিন পাগল হয়ে কামড়ে দিল বকুলকে। বকুলের মৃত্যু হল জলাতঙ্কে। পপিকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। আমার বাবা তার নামেই গড়ে তুলেছিলেন এই বকুলবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। আমি তাকে আর কোনওদিন দেখিনি, কিন্তু অনুভব করি সে যেন আছে কাছে-কাছেই।'

"পৃথাদির কথায় সকলেই আরও ভয় পেয়ে গেল। ওদিকে বাইরে তখন অন্ধকারের বুক চিরে আবার পড়তে শুরু করেছে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি। ক্রমশ মুষলধারে। পৃথাদি সকলকে সাহস দিয়ে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। ঘরের আর টয়লেটের আলো জ্বালা থাকুক, আমি আজ তোমাদের সঙ্গেই থাকব সারা রাত্তির। চলো, লুডো আর ক্যারম খেলা যাক। যাদের ঘুম পাবে, ঘুমিয়ে পড়বে। আমি জেগে আছি।'

"পৃথাদির দেওয়া এই সাহসে মেয়েরা ক্যারম, লুডো এইসব খেলতে-খেলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম ভেঙে দেখে সকাল হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। সূর্যদেব উঁকি মারছেন। গতকাল রাত্তিরের অন্ধকারের আর ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

"পৃথাদি কিন্তু আর কোনও ঝুঁকি নেননি। পরের দিন থেকেই হস্টেলের মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয় স্কুলের নতুন বাড়িতে। তারপর বর্ষার পরে ছাত সারাই হওয়ার পর পুরনো হস্টেলে ফিরে যাওয়া। সে তো আর-এক কাহিনী।"

এতক্ষণ একটানা গল্প বলার পর মা এবারে থামলেন। বাইরে আবার যেন একটা ঘোর-লাগা কাজল-কাজল ভাব। তুলি, অলি, তিতলি, চিকুলি সকলেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ছিল আর মন দিয়ে গল্প শুনছিল। তিতলি হঠাৎ একটু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "ও মাসিমণি, এখানে কোনও কুকুর নেই তো! ওই যে ঘাড-ঘাড একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি।"

মা বললেন, "ও তো রাস্তার কুকুর, পোষা কুকুর নয়। ওর নাম পপি নয়, ওর নাম ভোম্বল। ওকে আমরা বাসী রুটি খেতে দিই, খিদে পেয়েছে তাই ডাকছে।"

ছবি : বিমল দাস

অধিকাংশ মা-বাপই এই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখেন।

ইউ টি আই-এর চিল্‌ড্রেন্স কলেজ অ্যান্ড কেরিয়ার ফান্ড তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।

বার্ষিক সমাবর্তন-সভা। আপনার এবং আপনার সন্তানের জীবনে পরম উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। এবার তাকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে তুলেছে ইউ টি আই, তাদের চিল্‌ড্রেন্স কলেজ অ্যান্ড কেরিয়ার ফান্ড-এর মাধ্যমে।

আপনার সন্তানের বয়স যদি 15'র কম হয়, আপনি এখন থেকেই বিনিয়োগ করে, ওর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ শুরু করে দিতে পারেন। এর দৌলতে ও কলেজের বিভিন্ন ধাপ পর-পর এগিয়ে যেতে পারবে কিংবা জীবন গড়ার কাজ শুরু করে দিতে পারবে। ফান্ডের সময়ানুসার টাকা তোলার সুযোগ-সুবিধা, ঠিক যখন যেমন দরকার ঐসব টিউশন ফী এবং অন্যান্য সব ফী মেটাতে সাহায্য করবে। আপনি বছরের পর বছর যত বিনিয়োগ করবেন, ওর ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ফান্ড, অবিরত বাড়তেই থাকবে, কারণ ইউ টি আই আপনার টাকা এমনভাবে বিনিয়োগ করবে যে আপনার সন্তানের সাথে-সাথে বিনিয়োগও বাড়তেই থাকবে।

বৈ শি ষ্ট্য স মূ হ

● এক খোলা-অবধির যোজনা। ● 15 বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের জন্য যোজনা। 18 থেকে 23 বছর বয়সের মধ্যে সময়ানুসার কিস্তিতে টাকা তোলার সুবিধা। ● প্রতি ইউনিট 10 টাকা, কমপক্ষে বিনিয়োগ 2000 টাকা, এবং তারপরে 500 টাকার গুণিতকে। ● ফান্ডের বৃদ্ধি সময়ে সময়ে বোনাস ইউনিট-রূপে জমা করা হবে। ● প্রতি বছরে দুইবার আংশিক টাকা তোলা মঞ্জুর—18 বছর বয়সে 50%, এবং প্রতি বছরে অতিরিক্ত 10% করে, 23 বছর বয়স অবধি। ● অন্য সন্তানেরও নামে নমিনেশনের সুবিধা।

আমার সন্তানের কলেজের শিক্ষার জন্য আমি এখন থেকেই প্রস্তুত হতে চাই।

অনুগ্রহ করে ফান্ডের তথ্যপূর্ণ ব্রশিওর-যুক্ত- আবেদনপত্র আমাকে পাঠাবেন।

নাম ____________________

পদ/জীবিকা ____________________

ঠিকানা ____________________

____

__________ পিন কোড __________

ফোন : অফিস __________ গৃহ __________

অনুগ্রহ করে এই কুপনটি আপনার নিকটতম আমাদের অফিসে পাঠান— বাঁদিকের ঠিকানাগুলি দেখলেই পাবেন। AM

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

আপনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্যে

সব সিকিউরিটি বিনিয়োগই বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। সুতরাং বিনিয়োগের আগে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা/এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

কর্পোরেট অফিস্‌ : ১৩ স্যার বিঠল দাস ঠাকরসে মার্গ (নিউ মেরিন লাইন্‌স্‌), বম্বে -৪০০০২০ ফো : ২০৬৮৪৬৮ **জোনাল্‌ অফিস্‌ :** ২ ফেয়ার্লি প্লেস্‌, কলিকাতা -৭০০০০১ ফো : ২২০৯৩৯১ / ৫৩২২ **ব্রাঞ্চ অফিস :** আশানিবাস, ২৪৬ লিউইস্‌ রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১০১৪ ফো : ৫৬১৪১ ● ২ ও ৪ ফেয়ার্লি প্লেস্‌ কলিকাতা -৭০০০০১ ফো : ২২০৯৩৯১ ● তৃতীয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্‌ বিল্ডিং, দোতলা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ ফো : ৮১০২ ● হিন্দুস্থান বিল্ডিং, এম্‌.এল.নেহরু রোড পান বাজার, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ ফো : ৫৪৩১৩১ ● ব্যাঙ্ক অফ্‌ বরোদা বিল্ডিং, বিষ্টুপুর, জামশেদপুর -৮৩১০০১ ফো : ২৫৫০৮ ● জীবন দীপ বিল্ডিং, এক্সহিবিশন্‌ রোড, পাটনা -৮০০০০১ ফো : ২২২৪৭০ ● জীবন দীপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪৪০১ ফো : ২৪৬৭১

4 7 1 BEN

CHILDREN'S COLLEGE AND CAREER FUND

UNIT PLAN-93

কারণ আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের দায়িত্ব আপনারই

র‍্যামন, ওই তোতাটার গায়ে হাত দিলে তোমাকে খুন করব !
উফ !
রাক্ষস কোথাকার ! খুন করো !
যাচ্চলে !...আবার ফসকে গেল !
রডরিগো টরটিলা, তুমি আমাকে খুন করেছ ।
? ?
রডরিগো টরটিলা !
এটা তা হলে টরটিলার কাজ !
জোচ্চোর ! ডাক্তার সেজে ইউরোপে বেড়াতে আসা অছিলা, আসল মতলব ছিল বিগ্রহ চুরি... ভেবেছিল ব্যালথাজারকে খুন করে প্রমাণ লোপাট করেছে । কিন্তু তোতাটার কথা ভুলে গিয়েছিল !...ওর ঠিকানা পেয়েছি ...ওর সঙ্গে দেখা করব । ও কিছু সন্দেহ করবে না...
হেল্লো ? হোটেল লিবার্টি ? মিঃ টরটিলার সঙ্গে কথা বলতে পারি...
মিঃ টরটিলা ?...উনি তো চলে গেছেন... হ্যাঁ, দক্ষিণ আমেরিকায় । কাল দুপুরে...জাহাজ ? 'ভিল ডি লিয়ঁ'...
যা জানা দরকার জানা হয়ে গেছে
হেরে গিয়েছি ?...টরটিলা জাহাজে চেপে দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে...বোকা তোতাটা একদিন আগে কথা বললে...
...পরবর্তী সংবাদ এগারোটায়... এখন জাহাজ সম্পর্কে কিছু শেষ খবর...
বাজে খবর শুনে কী হবে ?
বন্দরকর্মীদের ধর্মঘটের জন্য যেসব জাহাজ কাল মাঝরাতের আগে ফরাসি বন্দর লা লাভরে থেকে ছাড়বে না মনে হয়, তার মধ্যে আছে দক্ষিণ আমেরিকাগামী জাহাজ 'ভিল ডি লিয়ঁ'...
হুররে ! র‍্যামন, ভরাডুবি হয়নি ! সময় আছে ! ওখানে পৌঁছে যাব !

কানভাঙা মূর্তি

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভূতের গল্প

বটুকদের আমবাগান

সমরেন্দ্র দাস

লেখাপড়া করে সত্যিই বড় হতে চায় বটুক। শুধু মাধ্যমিক পাশই নয়, একেবারে এম এ পর্যন্ত। ওই যে বাসস্ট্যান্ডের ধারে সিংহিবাড়ির মেজ ছেলে কেমন মসমস আওয়াজ তুলে চলাফেরা করে! যেদিকেই সে যাক না কেন, লোকে তাকে সবসময় ঘিরে থাকে। আহা, ঠিক ওই রকমটিই হতে চায় বটুক। বেশ একটা ভব্যিযুক্ত ভাব আর সুবিধেমতো বাংলার মাস্টারমশাই নরেনসারের মতো সব কথাতেই ভুরু কুঁচকে ভুল বের করে হম্বিতম্বি করা।

কিন্তু লেখাপড়ার দিকে তার মাথা একেবারেই খোলে না, অথচ মাথা লম্বাও হয়ে চলে আর বড় তো বটেই! বটুকের বাবা অতশত বোঝেন না। তাঁর চাহিদাও বটুকের মতো বেশি নয়। বটুক হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করে শুধু কলেজে ঢুকুক। ডিভিশন তিনি চান না। কলেজের পরীক্ষায় বটুকের পাশ করাটাও তাঁর কাছে বাধ্যবাধকতামূলক নয়। তিনি যেন সব জায়গায় বলতে পারেন যে, তাঁর ছেলে কলেজে পড়ে। হ্যাঁ, এইটুকুতেই হবে তার সন্তুষ্টি! কেননা, তাঁর বটুক তো আর চাকরিবাকরি করতে যাবে না কোথাও! ১০ বিঘা জমির ওপর এই আমবাগান দিয়ে হেসেখেলে দিব্যি সে চালিয়ে নিতে পারবে। তা ছাড়া দুটো পারমিটের বাস আছে এখন মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ লাইনে। খেটেখুটে সবদিক চালিয়ে লালবাগ হাসপাতালের কাছে একটা বড় দেখে ওষুধের দোকান করতে পারলে আর ভাবনা কী?

আসলে বটুকের বাবা নিত্যানন্দ রায়ের নিজের খুব ইচ্ছে সন্ধেবেলাগুলো জমিয়ে আড্ডা দেবেন ছেলের রোজগারের পয়সায় আর রাজা-উজির মারবেন। কিন্তু ব্যবসা ভাল করলেও সবদিক গুছিয়ে নিতে পারেননি তিনি ঠিকমতো। একটা নতুন আমবাগান করারও তাঁর অনেকদিনের সাধ। সেখানে উলটোপালটা গাছ তিনি একদম রাখবেন না। শুধু তিন-চার রকমের কলমের গাছ—কোহিতুর, রানিপসন্দ এবং সাদউল্লা, ব্যস। সেই জন্যই ভোরবেলা সাইকেলে করে লালবাগ থেকে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পুরুতের বাড়ি গিয়েছিলেন। জমির ব্যাপারটা পুরো ফয়সালা না হলেও অনেকটা কাজই এগোল। কিন্তু মাথায় ভারী দুশ্চিন্তা নিয়ে নিত্যানন্দবাবু বাড়ি ফিরছেন। পুরুতমশাইয়ের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। বেয়াই বাড়িতে এককুড়ি কোহিতুর আম তাঁর চাই। আম পেলে জমিও তিনি দিয়ে দেবেন। তবে তাঁর বাগানে কোহিতুর আম যে একেবারেই ফলন দেয় না!

ফাল্গুন শেষ হতে যাচ্ছে। চারদিকে আমের বোলের সুগন্ধ। বড় করে গন্ধ নেন সাইকেল চালাতে চালাতে। মাঝে-মাঝেই শিমুল আর পলাশের লাল সৌন্দর্য পথটাকে আরও মোহময়ী করে তুলেছে। সাইকেল চালাতে-চালাতে এলোমেলো ভাবনাগুলোকে তিনি একটা জায়গায় আনতে চাইছিলেন এবং বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একটা পথ যেন হঠাৎই তাঁর খুলে গেল।

আজ রবিবার। বটুক জানত বাবা গেছেন কিরীটেশ্বরী পুরুতমশাইয়ের বাড়ি। কী মেজাজে ফিরবেন কে জানে। তার চেয়ে পড়ার বইপত্র সামনে খুলে রেখে যা ইচ্ছে করো। সাইকেলের আওয়াজ পেলেই হাতের সামনে যে-কোনও একটা বই খুলে পড়ে গেলেই চলবে।

না, বাবার মেজাজ মনে হচ্ছে ভালই। খাওয়াদাওয়ার আগে বটুকের কোনও খোঁজই পড়ল না। খেতে বসে নিত্যানন্দবাবু ছেলের

সঙ্গে এটা-সেটা কথার পরই আচমকা বললেন, "তোর পরীক্ষা শেষ হবে কবে রে ?"

"শশ এপ্রিল।" তারপর মুখ তুলে বলল, "আমি কিন্তু বেশ মন দিয়েই পড়ছি বাবা।"

নিত্যানন্দবাবু পরম তৃপ্তির সঙ্গে রুইমাছের ঘিলুটা সুড়ুত করে টেনে নিয়ে বললেন, "শোনো—পরীক্ষার পর তোমাকে রোজ আমবাগানে রাতের বেলা থাকতে হবে। দিনের বেলা যেমন খুশি খেলবে-টেলবে। কিন্তু রাতে বাগানের দু'জন মালির সঙ্গে তোমাকে এবার মাচায় থাকতে হবে। বাগানের কোহিতুর আম এবার বাঁচাতেই হবে। কী যে হয়। একটু বড় হলেই পড়ে যায়। কেউ নিশ্চয়ই শত্রুতা করে..."

"কিন্তু বাবা, শত্রুতা যদি করেই, আর আমি যদি বুঝতেও পারি, গায়ের জোরে তো পারব না তেমন !"

নিত্যানন্দবাবু এবার একটা হুঙ্কার দেন। "তোমার বলতে লজ্জা করে না ? কতদিন বলেছি বান্ধব সমিতিতে ভর্তি হও, একটু-আধটু ডন বৈঠক, দাও। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! ছিঃ ! ছিঃ ! আমার ছেলে হয়ে কিনা—"

অগত্যা বটুককে চুপ করেই যেতে হয়। সে মনে-মনে ভাবে, তার সবচেয়ে বড় শত্রু বোধহয় ভগবান। এই পরীক্ষা, কত পড়া এখনও বাকি। পাটিগণিতটা যাও বা হয়েছে বীজগণিত আর জ্যামিতি তো কিস্সু হয়নি। ভাবতেই যেন গা'টা শিউরে ওঠে।

না, যতটা ভেবেছিল ততটা খারাপ পরীক্ষা হয়নি, তবে ওই অঙ্ক পরীক্ষাটা ছাড়া। একটু আগেই বাবা সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে বটুককে আমবাগানে মালিদের কাছে ছেড়ে গেছেন। মাচার মধ্যে শুয়ে আকাশের তারা দেখতে-দেখতে মশাদের ভনভনানি আর কটুস-কাটুস কামড় খাচ্ছিল সে। বাবার ওপরে তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। কিন্তু দুনিয়ায় ছোট ছেলেদের আর কে সহায় হয়েছে ? ভগবানও তো সেইরকম। শ্মশানকালীর মন্দিরে মাঝে-মাঝেই তো ১০ পয়সা কি চার আনা দেয় বটুক, আর মনে-মনে বলে, 'মা আমার ভুলো মনটা একটু শুধরে দাও তুমি—পড়াশোনটা যেন ভালভাবে করতে পারি। টকাস-টকাস সব পরীক্ষায় পাশ করে যাই। বাবার দৃষ্টি যেন সবসময় আমার দিকেই না থাকে।' কিন্তু কোথায় কী ? বটুকের সমস্যার যেন আর শেষ হয় না। সারা মুর্শিদাবাদে তো কম কোহিতুর গাছ নেই। শুধু তাদের বাগানের আম পাকে না কেন ? কেই বা আগে আমগুলোকে পেড়ে নেয় বা গুটি ধরার কিছু পরেই পাখপাখালি বা কে যেন শত্রুতা করে ফলগুলোকে ঝরিয়ে দেয় !

এইসব ভাবতে-ভাবতে দূরে মালিদের চালানো রেডিয়ো-য় গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কী যেন এক কারণে যখন তার ঘুমটা ভেঙে গেল, বুঝতে পারল এখনও ভোর হয়নি। চারপাশে চাপ-চাপ কালো অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার একটানা ঘ্যানঘেনে শব্দ। খচর-মচর আওয়াজ তুলে কুকুর কি শেয়াল আমপাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলাফেরা করছে। বাড়ির তক্তপোশ নয় বাঁশের বাতা দেওয়া মাচায় সে শুয়ে। একটু যেন জলতেষ্টাও পাচ্ছে তার। কিন্তু এখানে তো মা কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা দিয়ে রেখে যাননি। অগত্যা আবার পাশ ফিরে শুতে গিয়েই যেদিকে চোখ পড়ল, তা দেখে সে প্রায় শিঁউরে উঠল। পাঁচ-ছ' জোড়া বড়-বড় আলো-জ্বালা চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। হায়েনা কিংবা শেয়াল নাকি ? শিশিরের ফোঁটা-ফোঁটা জল কোথায় যেন টপটপ করে পড়ছে। বটুক এত ভয় পেয়ে গিয়েও হঠাৎ ভাবল, আমার তো গায়ে জোর নেই। কিন্তু বাংলার নরেনসার বলেছেন, দেহের শক্তি না থাকলেও মনের শক্তি যে-কেউ-ই সঞ্চয় করতে পারে। এই বিশ্বাসে বটুক জিজ্ঞেস করল, "কে তোমরা, কী চাও ?"

একজোড়া চোখ একথা শুনেই যেন খেপে গেল। বেশ রাগ-রাগ গলায় বলে উঠল, "বা রে মজা, পাপড় ভাজা ! আমাদের জায়গায় এসে আবার আমাদেরই চোপা ! আগে বল তুই কে ?"

বটুক বুঝতে পারল বেশ শক্ত জায়গাতেই সে এসে পড়েছে। কিন্তু সে জানে ভয় পেলে চলবে না এখানে। তাই সাহস করে বলল, "আমি, নিত্যানন্দ রায় এই আমবাগানের মালিক, তাঁর ছেলে বটুকচন্দ্র রায়। বাগান পাহারা দিতে এসেছি।"

অন্য একজোড়া চোখ কোথায় রেখেছিল তার হাত দুটো কে জানে, এখন সেই হাত দুটো দিয়ে বেজায় এক তালি মেরে হেঁকি তুলে তুলে অদ্ভুত হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, সেই নেতার ছেলে তুই। বটে-বটে, আবার কিনা বলা হচ্ছে বাগান পাহারা দিতে এসেছি !"

খুব রাগ হয়ে গেল বটুকের বাবার সম্পর্কে এহেন কথাবার্তায়। যদিও সে

বাবার ওপর খুব একটা খুশি নয়। তাঁর জন্যই তো বাড়ির আরামের বিছানা ছেড়ে আমবাগানে রাত কাটানো ! সে একরোখা গলায় বলল, "ভাল হবে না কিন্তু, বাবার নাম ধরে কথা বললে... !"

অন্য একজোড়া চোখ এবার গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "আঃ তোরা একটু থামবি ? আমায় কথা বলতে দে।" তারপর বটুককে জিজ্ঞেস করল, "এটা আবার তোদের বাগান কবে হল রে ? আজ প্রায় আড়াইশো বছর ধরে আমরা এখানে আছি, তোদের বললেই হয়ে গেল আর কী ? এসব দামি-দামি আমগাছ কি তোর বাবা লাগিয়েছেন ?"

বটুকের এবারি চিন্তা হল, এদের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা যুক্তি রয়েছে, তবে আড়াইশো বছরের ব্যাপারটা তার ছোট্ট মাথায় তেমন ঢুকল না। সে বলল, "দ্যাখো, আমি যা জানি তাই বলেছি, এ-বাগান আমার বাবার বাবা অনেকদিন আগে কাশিমুদ্দিনের কাছ থেকে কিনেছিলেন, তাই এখন এটা আমাদেরই। তবে তোমাদের কথাটাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না ! তা তোমরা কি ওইসব গাছ লাগিয়েছিলে ? আর আড়াইশো বছর কি মানুষ বাঁচে নাকি ? তোমরা আসলে কে বলো তো ?"

সেই গম্ভীর গলাটা ছাড়া সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যে, বটুক কিছুই বুঝতে পারল না। তাই সে এক ধমক লাগাল। তারপর গম্ভীর গলাকে বলল, "তুমি, মানে আপনি একটু গ্রামাকে সব বুঝিয়ে বললেন ?"

গম্ভীর গলায় লোকটা একটু যেন গলাখাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করল, "ন্যাখো, আমরা হলাম ভূত। এখন অবশ্য অনেকেই অবস্থার বিপাকে না পড়লে আমাদের বিশ্বাস করতেই চায় না। কিন্তু সে অনেককাল আগের কথা, ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লার পলাশির যুদ্ধে আমরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যাই। শুনতে পাই, তোমরা আমাদের অন্য একটা কী নামে যেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে, তোমরা আমাদের ডাকো শহিদ বলে। কিন্তু আসলে শহিদ মিনার বা শহিদ নগর থাকলেও আমরা আসলে সব ভূত। এখানে যে ছ'জোড়া চোখ তুমি দেখছ, আমরা সবাই একসঙ্গে মারা যাই সেই ১৭৫৭ সালে। কিন্তু পলাশিতে মারা গেলে মুর্শিদাবাদের এই আমবাগানের মায়া আমরা কাটাতে পারিনি। তাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু তোমরা আমগাছও ভালবাস না, আমও নয়। শুধু টাকা কামাতে চাও এইসব বাগান দিয়ে। সুদূর পারস্য দেশ থেকে আনা এইসব অমূল্য আমগাছগুলো আবার ইদানীং রাতের বেলা চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে একদল চোরাকারবারি। সবচেয়ে খারাপ লাগে আমাদের, এই বাগানের দামি আম কোহিতুরকে নিয়ে।"

বটুক ভূতটার কথাটাকে প্রায় লুফে নিয়ে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য! আমিও তো ওই কোহিতুর গাছটার জন্যেই এসেছি। বাবার এত প্রিয় এই গাছ! কিন্তু কিছুতেই গাছটার ফল বাঁচাতে পারা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন কিছু এ-ব্যাপারে ?"

"আরে ছোঃ! তোমরা কোহিতুর আমের বোঝোটা কী? ওই তো নবাববাগানের কোহিতুর আমগাছগুলোর দশা দেখছি! গাছের যত্ন-আত্তি তো কিছুই করো না। খালি আম চাই! তা কোহিতুর আমকে পাকবার কিছু আগে পেড়ে নিয়ে ঘড়ি ধরে আধঘণ্টা একবার তালুতে করে ডান দিকে ঘোরাতে হবে, আবার বাঁ দিকে! তারপরে বোঁটা কেটে আবার আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা। এখন আর এঁসব জানেই বা ক'জন? তাই আমরা কোহিতুর আমগুলোকে তোমাদের হাতে দিই না, নিজেরাই খাই! আঃ, তার কী স্বাদ। আবার সেদিন তোমার বাবার বাগানের মালি দুটো আমার চোখে কী একটা লাগাল। বাব্বা, দু'দিন কী তার জ্বলুনি। আমি শুয়েছিলাম গাছের ডালে!"

খুব মন দিয়ে বটুক শুনছিল গম্ভীর গলাওলা ভূতটার কথা। সে হাত জোড় করে অনুনয় করল, "দেখুন, ওরা বোকা লোক, আপনাকে বুঝতে পারেনি। তাই বোধ হয় কোনও ওষুধ স্প্রে করেছিল। আমি বলে দিচ্ছি, এরকম ভুল আর হবে না, তবে আপনাকেও একটা কন্ট্রাক্ট করতে হবে—এই বাগানের কোহিতুর আম আপনারা অর্ধেক খাবেন, অর্ধেক বাঁচিয়ে রাখবেন।"

ভূত আরও গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "আবার সেই কন্ট্রাক্ট! একবার তো ক্লাইভ ব্যাটার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে মীরজাফর আমাদের মেরেছিল। তুমিও সেই কন্ট্রাক্ট করতে চাও ?"

বটুক এবার ভূতটার মতোই গম্ভীর গলা করে বলল, "না, এটা ভাল কন্ট্রাক্ট। ভাল ভূতেদের সঙ্গে বটুকচন্দ্র রায়ের কন্ট্রাক্ট! আমি বাবাকে বলে কালই মালি দুটোকে এই বাগান থেকে তাড়াব। আপনার মতো প্রবীণের চোখে সে ওষুধ স্প্রে করেছে এইজন্য। আপনারা তো আমাদের গাছগুলোকে পাহারা দেন, তাদের দেখভাল করেন। আপনারা এই বাগানের আসল মালিক। শুধু আমাদের জন্য কোহিতুর আম দেবেন ভালমতো। গাছের ফলন বাড়িয়ে সেইসব ফল আপনারা খাবেন। তা হলে বাবার লোকসানও হবে না। ও, আর-একটা কথা, আমি খুব ভাল করে পড়াশোনা করতে চাই, কিন্তু মাথায় কিচ্ছু রাখতে পারি না। এবারে অঙ্ক পরীক্ষাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে—একটু এ-ব্যাপারটা দেখবেন ?"

কে যেন এবার এগিয়ে এল। গম্ভীরগলা ভূতটাকে বলল, "কর্তাবাবা, ছেলেটাকে তো ভালই মনে হচ্ছে। আপনার অনুমতি পেলে ওর অঙ্কের খাতাটায় একটু ভেল্‌কি লাগাব নাকি ?"

অন্য ভূতগুলোর খ্যাকখেকে হাসি শোনা গেল এবার। কে একজন বলেই ফেলল, "আরে, এখনকার অঙ্কের তুই ব্যাটা কী জানিস, এখন তো শুনেছি সব কঠিন-কঠিন অঙ্ক দেয়!"

বটুক সাহস পেয়ে বলে উঠল, "ঠিক বলেছেন, কোথা থেকে যে বীজগণিত আর জ্যামিতির প্রশ্নগুলো দিয়েছে কে জানে। কিছুতেই পারলাম না। সম্পাদ্যটা যাও বা একটু করেছি, উপপাদ্য ধরতেই পারিনি। আর বীজগণিতটা আমার মাথায় ঢোকেই না তেমন!"

গম্ভীরগলা ভূতটা সেই ভূতটাকে জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ, তুই কী ভেল্‌কির কথা বলছিস শুনি একটু। শেষে ছেলেটার বিপদ-টিপদ আবার না হয়!"

"বছর তিনেক আগে কলকাতা থেকে তিনজন ছেলে এসেছিল মুর্শিদাবাদ বেড়াতে। তারপর কী জানি কী করে প্যালেসের ঘাটে চান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় একজন তাদের মধ্যে। ওই ছেলেটি ছিল লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল। সেই থেকে ও নবাব প্যালেসে এলাচ গাছের মাথায় আছে। খুব ভাল ছেলে, তবে একটাই রোগ, প্যালেসের যেখানে-সেখানে নতুন রং-করা দেওয়ালে ইট দিয়ে অঙ্ক করে বেড়ায়। ওকে এই কাজটা দিলে খুশি মনে করবে। তার তা হলে বটুকের সমস্যার সমাধানও হয়ে যাবে।"

এ কথা শুনে শুধু গম্ভীরগলা ভূতই নয়, সকলেই সমস্বরে চিৎকার করে স্বাগত জানাল সেই ভূতটাকে। বটুক পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। আর তারপরই সব কিছু সুনসান। কেউ কোথাও নেই। শুধু বসন্তের মিঠে হাওয়া, আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধে বটুকের দু'চোখ বুজে এল।

ছবি : শেখর রায়

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রহস্য যখন গভীর

দেবল দেববর্মা

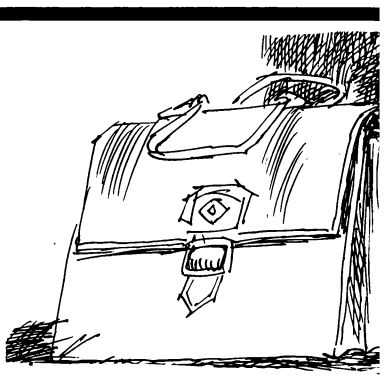

বেলা একটা নাগাদ প্রলয় লাবণি হাউসিং এস্টেটের স্টপে বাস থেকে নামল। সুমনদের বাড়িটা দূরে নয়। হাঁটলে বড়জোর সাত-আট মিনিট লাগে। প্রলয় একবার ভাবল, একটা রিকশা নেবে কি না। পরক্ষণেই তার মনে হল, হেঁটে গেলেই বরং সুবিধে। যেতে-যেতে হঠাৎ যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়। মাসিমা কিংবা সুমন নিজেও তো কোনও প্রয়োজনে লাবণির দিকে আসতে পারে। তা ছাড়া গেটের কাছে তাকে রিকশা থেকে নামতে দেখলে বাড়িতে একটা অকারণ হইচই পড়ে যাবে।

হাঁটতে-হাঁটতে সমনদের বাড়ি সে পৌঁছে গেল। গেটটা বন্ধ। একটা বোগেনভেলিয়া লতা বাঁ দিক থেকে উঠে গেটের মাথায় ছড়িয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে সে দরজার পাশে ডোর-বেলের বোতাম টিপল। কয়েক সেকেন্ড পরেই সুমন দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল, "এসে গিয়েছিস। আমি তো সেই সকাল থেকে তোর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।"

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "ছোটদাদুর কোনও খবর পেলি?"

সুমন একটা হতাশ ভঙ্গি করল। বলল, "সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গাতেই খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছোটদাদুর পাত্তা নেই।"

"আচ্ছা, গতকাল উনি স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন? সেখানে খবর নিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।" সুমন জবাব দিল। "গতকাল বিকেল চারটে নাগাদ উনি স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর থেকেই ওঁর কোনও হদিস নেই।"

প্রলয় মাথার চুলে হাত বুলিয়ে কী যেন ভাবছিল। প্রায় মিনিটখানেক পরে সে বলল, "কোনও দুর্ঘটনা, মানে অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো?"

"বাবা প্রথমে এমনই একটা খারাপ কিছু আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত লালবাজার থেকে যে খবর পাওয়া গেছে তাতে ছোটদাদুর বয়সী কোনও লোকের অ্যাকসিডেন্টের খবর নেই।"

"তা হলে তিনি গেলেন কোথায়? কর্পূরের মতো উবে যাবেন নাকি?" প্রলয় মন্তব্য করল।

সুমনকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বলল, "আমার খুব ভয় করছে জানিস! সেই সাধুটা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে শেষপর্যন্ত তাই ঘটবে নাকি?"

"আরে না, না। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস।" প্রলয় তাকে আশ্বস্ত করল। বলল, "কোথাকার কে সাধু এসে কী ফোরকাস্ট করে গেল, আর তুই অমনই তাই সত্যি ভেবে নিয়েছিস।"

সুমন বলল, "আমি সত্যি না ভাবলে কী হবে? মা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছোটদাদু নিশ্চয় একটা চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। যারা এ-বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল সেই দলের লোকেরাই তাঁকে গায়েব করে রেখেছে।"

প্রলয় ঈষৎ চিন্তা করে বলল, "কিন্তু গায়েব করে রেখে তাদের কী লাভ?"

"লাভ নিশ্চয় আছে। ছোটদাদুর কাছে তারা সেই পুরনো জিনিসটার সন্ধান নেবে। সেটা কোথায় আছে তিনি যদি তা বলে দেন।"

"আর ছোটদাদু যদি বলতে রাজি না হন?"

"তা হলে ওরা সাঙ্ঘাতিক কিছু করতে পারে। এমনকী ছোটদাদুর জীবনের আশঙ্কাও আছে।" সুমন চিন্তিতমুখে তাকাল।

প্রলয় কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঘরের ভেতর থেকে সুমনের মা বেরিয়ে এসে বললেন, "তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"এই তো একটু আগে মাসিমা।" প্রলয় জবাব দিল।

"সকালে সুমন তোমাকে টেলিফোন করেছিল। নিশ্চয় সব শুনেছ?"

"হ্যাঁ, ছোটদাদু নিখোঁজ। গতকাল রাত্তির থেকে বাড়ি ফেরেননি।"

সুমনের মা বললেন, "এরকম একটা কিছু যে ঘটবে আমি সেই ভয় করেছিলাম। শেষপর্যন্ত তাই হল।"

প্রলয় বলল, "আপনি অত চিন্তা করবেন না মাসিমা। ছোটদাদু আবার ফিরে আসবেন।"

"কী জানি বাবা।" সুমনের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "সেই যে সন্নিসি লোকটা এসে নানারকম ভয় দেখিয়ে গেল, তারপর থেকেই আমার বুকের ভেতরে একটা কাঁপুনি হত। রাত্তিরে বিদঘুটে স্বপ্ন দেখতাম। কতদিন বলেছি ওসব পুরনো জিনিস কাছে না থাকাই ভাল। জঞ্জালের মতো জমিয়ে রেখে কী লাভ হয়? বরং ধুর ছাই বলে ফেলে দিলেই ঝামেলা মিটে যায়। তা উনি কি আমার কথা কানে নিতেন? ঠাট্টা করে সুমনের বাবাকে বলতেন, 'তা হলে তো পুরনো থালা-বাসন, গয়নাগাটি, জামাকাপড় সবই ফেলে দিতে হয়।' আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শোনাতেন, 'মা-বাবা বুড়ো হলে নিশ্চয় পুরনো হয়ে যায়। তা হলে

তাদেরও বিদেয় করে দিয়ো।'"

প্রলয় হেসে বলল, "ছোটদাদু ঠিক সাধু-সন্নিসিতে বিশ্বাস করেন না। তাই এসব কথা উনি গায়ে মাখেননি।"

"সে তো বুঝলাম বাবা। কিন্তু গতকাল বিকেলের পর উনি গেলেন কোথায়? সুমনের বাবা খবর নিয়ে এসেছেন যে, বেলা চারটের সময় উনি স্টুডিয়ো বন্ধ করে বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর ওঁকে আর কেউ দেখতে পায়নি।"

"সেটাই তো আশ্চর্যের কথা! জলজ্যান্ত একটা মানুষ কলকাতা শহর থেকে মিলিয়ে গেল?" সুমন বলল।

প্রলয় কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "মেসোমশাই কোথায়?"

"উনি এক বন্ধুর কাছে গিয়েছেন। পুলিশের ওপর মহলে তাঁর জানাশোনা আছে। যদি সেই ভদ্রলোক কোনও সুরাহা করে দেন, পুলিশ যাতে এই কেসটার ওপর নজর দেয়।"

প্রলয় বলল, "আচ্ছা, ছোটদাদুর ঘরটা আপনারা ভাল করে দেখেছেন?"

"উনি কোনও চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছেন কি না তাই জানতে চাও তো?" সুমনের মা জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। আমি বলছিলাম ছোটদাদুর ঘরটা একবার খুঁজে দেখা ভাল, অনেক সময় কোনও চিঠিপত্র থেকে নিরুদ্দেশের কারণ বেরিয়ে পড়ে।"

"সে না হয় একবার তোমরা খুঁজে দেখবে। তবে টেবিলে কিংবা অন্য কোথাও ছোটকাকুর হাতে লেখা একছত্র চিরকুটও আমার চোখে পড়েনি।"

সুমন বলল, "ঠিক আছে। ঘরটা না হয় দু'জনে একবার সার্চ করে দেখব। যদি তেমন কোনও কাগজপত্র হাতে আসে।"

প্রলয় বলল, "আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস ছোটদাদু ঠিক ফিরে আসবেন।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা।" সুমনের মা সহাস্যে তাকালেন। বললেন "ছোটকাকু ফিরে না আসা পর্যন্ত সুমনের বাবা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারবেন না।"

খানিকক্ষণ পরে সুমনের সঙ্গে সে ছোটদাদুর বাড়িতে ঢুকল। দক্ষিণ খোলা মোটামুটি বড় ঘরখানা। বাড়ির পেছনে বলে যেন একটু বেশি চুপচাপ, নির্জন। পড়ন্ত বেলায় জানলার ফাঁক দিয়ে একচিলতে রোদ মেঝেতে এসে পড়েছে।

ঘরের ভেতরে একটা সিঙ্গল খাট। মাঝারি সাইজের টেবিল একপাশে। তার দুটো ড্রয়ার। টেবিলের ওপর একটা পুরু কাচ পাতা। নীচে বেশ কিছু ভিজিটিং কার্ড। কাচের তলায় ছোট ক্যালেন্ডার। বাঁ দিকে চিঠিপত্র, খুচরো কাগজ রাখার জন্য একটা স্টেশনারি বক্স।

খাটের পাশে দু'খানা চামড়ার সুটকেস। সুমন বলল, "ছোটদাদুর জামাকাপড়, কাগজপত্র, সব ওই সুটকেসের ভেতরে।" মুখ তুলে তাকিয়ে প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "সুটকেসের চাবি কোথায় আছে?"

"বা রে, চাবি তো ছোটদাদুর পকেটে থাকে।"

"তা হলে?" প্রলয় একটা হতাশ ভঙ্গি করে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

সুমন হঠাৎ বলল, "সুটকেসের ডুপ্লিকেট চাবি মায়ের কাছে থাকতে পারে।"

"তাই?" জলে ডুবে যাওয়া মানুষের মতো প্রলয় যেন উদ্ধারের আশায় একটা ভাসমান কাঠের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, "তা হলে মাসিমার কাছে একবার খোঁজ কর।"

তিন-চার মিনিট বাদেই সুমন ফিরল। বলল, "যা ভেবেছি, ডুপ্লিকেট চাবিটা মায়ের কাছেই ছিল। ছোটদাদু রাখতে দিয়েছিলেন।"

চাবি ঘুরিয়ে দুটো বাক্সই পর-পর খুলে ফেলল সুমন। ডালা খুলতেই জামা-কাপড়, একটা গরম কোট চোখে পড়ল। প্রলয় ধীরে-ধীরে সেগুলি নামিয়ে ভেতরে আরও কী আছে তাই দেখছিল।

সুমন বলল, "যে লোকটা বাক্স থেকে পুরনো রিস্টওয়াচটা নিয়ে পালিয়েছে, সে কিন্তু নিজেই সুটকেস দুটো খুলে ফেলেছিল। চাবি-টাবি লাগেনি।"

প্রলয় বলল, "চোরদের কাছে একরকম যন্ত্র থাকে। তাই দিয়ে ওরা চটপট তালা ভেঙে ফেলে।"

দ্বিতীয় বাক্সটার নীচে খানদুই-তিন চিঠি। প্রলয় সযত্নে সেগুলি বের করল। সব চিঠি ছোটদাদুর নামে। খামের ওপর স্পষ্ট লেকের তাদের বাড়ির ঠিকানা স্পষ্ট লেখা। প্রথম চিঠিখানা এক বন্ধুর বলেই মনে হল। ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে লিখেছে। সাদামাঠা চিঠি। এখন কী বিষয় নিয়ে ছোটদাদু কাজ করছেন? আগ্রা থেকে কলকাতায় এসে তাঁর কেমন লাগছে? সময় পেলে তিনি যেন একবার ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে যান। এখানকার লিঙ্গরাজ মন্দির নিশ্চয় আগেও দেখেছেন। তবু এই বিচিত্র স্থাপত্য বারবার দেখেও তো আশ মেটে না।

দ্বিতীয় চিঠিখানা বোম্বাই থেকে এসেছে। ইংরেজিতে টাইপ করা কয়েক লাইনের চিঠি। যার বাংলা তর্জমা করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায়:

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত সপ্তাহের চিঠি পাইলাম। আগ্রাতে আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট হইতে ঠিকানাটি সংগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন। সেই সূত্রেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য লিখি যে, মিঃ ইয়েটস আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছাইবেন। এই বিষয়ে যথাসময়ে আপনাকে অবহিত করা হইবে।

শুভেচ্ছান্তে—

চিঠির নীচে স্বাক্ষরকারীর সইয়ের পাঠোদ্ধার করতে না পেরে প্রলয় গালে হাত দিয়ে কী যেন চিন্তা করছিল।

সুমন বলল, "মিঃ ইয়েট্‌স লোকটি কে ? কোনও বিখ্যাত শিল্পী, মানে আর্টিস্ট ? কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছোটদাদুর কী সম্পর্ক ?"

"সেটা জানলেই তো রহস্যের জট অনেকখানি খুলে যায়।" প্রলয় ঈষৎ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল।

"আচ্ছা, চিঠিখানা লিখেছে কারা ?" সুমন জিজ্ঞেস করল।

"লেটার প্যাডে এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর নাম। ঠিকানা শুধু বম্বে লেখা। বাড়ির নম্বর, কোন রাস্তায় অফিস এসব বোঝা যাচ্ছে না।"

সুমন বলল, "দেখা যাক না বাক্সে ওদের আরও চিঠি থাকতে পারে।"

প্রলয় একটু চিন্তা করে বলল, "একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, ওই ফার্মের ঠিকানা ছোটদাদু জানতেন। তার মানে এই যে, এর আগেও ওরা তাঁকে চিঠি লিখেছে। সম্ভবত সেই চিঠিতেই তাদের বোম্বাই অফিসের সম্পূর্ণ ঠিকানার উল্লেখ ছিল।"

সুমন বলল, "চিঠিটা পড়লেই তো বোঝা যায় যে, ওরা আগ্রার আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে ছোটদাদুর কলকাতার ঠিকানা জোগাড় করে। তারপর প্রথম চিঠিতেই তাঁকে সব কথা লিখে জানিয়েছে।"

"হ্যাঁ, সেই চিঠিখানা পেলেই ব্যাপারটা বোঝা যেত। বোম্বাইয়ের এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং কেন ছোটদাদুকে চিঠি লিখেছিল ? মিঃ ইয়েট্‌স যে সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় আসছেন সেটাই বা তাঁকে জানাবার কী দরকার হল ?"

তৃতীয় চিঠিখানা খুলে রীতিমত আশ্চর্য হল প্রলয়। চিঠি তো নয়, এ যাকে বলে সেই পত্রাঘাত। শাসানিও বলা চলে। আসলে এটি ছ' লাইনের একটি কবিতা। কোনও সম্বোধন নেই। কিন্তু কাকে উদ্দেশ করে যে লেখা তা আন্দাজ করে নিতে আদৌ অসুবিধে হয় না। কবিতাটি এরকম :

কহিছে কলের ঘড়ি টিক টিক টিক
যাহা করিতেছ তুমি তাহা নহে ঠিক।
ভাল যদি চাহ বাপু বের করো সটা
নহিলে ধড়টি রবে, মুণ্ডুটি কাটা।
সাতদিন বেঁধে দিনু সময়ের সীমা
মনে রেখো তারপর নাহি পাবে ক্ষমা।

সুমন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটি বড়-বড় করে বলল, "আরি বাস, এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা। এর পর ছোটদাদুর অবস্থা ভেবে আমার হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

প্রলয় বলল, "অত নার্ভাস হচ্ছিস কেন ? একটা কথা চিন্তা কর। এরকম সাঙ্ঘাতিক একটি কবিতা হাতে পেয়েও ছোটদাদু কিন্তু ঘাবড়ে যাননি।"

"হ্যাঁ, সেটা তো বুঝতেই পারছি। নইলে এই চিঠির কথা বেমালুম চেপে যান ! এমনকী বাবাকে পর্যন্ত কোনও ইঙ্গিত দেননি।"

প্রলয় ভুরু তুলে বলল, "আবার এমনও হতে পারে যে, এই চিঠিটাকে উনি আদৌ গ্রাহ্য করেননি।"

"কী জানি বাপু ! মুণ্ডু কাটা যাবে বলে ভয় দেখিয়েছে। তবুও ছোটদাদু নির্বিকার। ভাবতেই কেমন লাগছে।" এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল সুমন। তারপর বলল, "চিঠিখানা এসেছে কবে ?"

খামের ওপর পোস্ট অফিসের শিলমোহর পরীক্ষা করে প্রলয় বলল, "গত সপ্তাহে, দিন আষ্টেক আগে।"

সুমন বলল, "তারপর থেকেই ওরা তক্কে-তক্কে ছিল। সুযোগ পেয়ে ছোটদাদুকে গায়েব করতে আর বিলম্ব করেনি।"

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "তোর কী মনে হয় ছোটদাদুকে ওরা কোথাও বন্দি করে রেখেছে ?"

"তা ছাড়া কী ?" সুমন উকিলের মতো পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা শুরু করল। বলল, "প্রথমে সন্নিসি সেজে ওরা আমাদের সাবধান করে গেছে। একটা পুরনো জিনিস যদি খোওয়া যায় তা হলে সেটা পরিবারের পক্ষে মঙ্গল হবে। উলটে কেউ যদি সেটি গোপন করতে চায় তা হলে একটা দুর্ঘটনা, এমনকী বাড়ির কারও জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত হতে পারে। তাই সেই পুরনো জিনিসটির জন্য ওরা একদিন রাত্তিরে বাড়িতে হানা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দলের একটা লোককে এই বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে ছোটদাদুকে উদ্দেশ করে এই সাঙ্ঘাতিক কবিতাটি পাঠিয়েছে। তারপর দিনদুপুরে বাক্স-প্যাঁটরা ভেঙেও যখন সেই ঈপ্সিত জিনিসটি পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়েই ছোটদাদুকে তাদের গায়েব করতে হল।"

"কিন্তু সুটকেসের তালা ভেঙে কাজের লোকটা তো একটা পুরনো রিস্টওয়াচ নিয়ে চম্পট দিয়েছে।"

"এবার তুই হাসালি।" সুমন মন্তব্য করল। বলল, "ওই পুরনো রিস্টওয়াচটার জন্য যে চোর সুটকেসের তালা ভাঙেনি, সেটা তো একটা শিশুও বলে দিতে পারে। আসলে সুটকেসের তালা ভেঙে ওই রিস্টওয়াচটা হাতের কাছে পেয়ে সে ব্যাটা আর লোভ সামলাতে পারেনি।"

"শুধু কি তাই ?" প্রলয় যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়।" সুমন তার অভিমত জোরালো কণ্ঠে ব্যক্ত করল। বলল, "ছোটদাদুর ওই বাতিল হাতঘড়িটার জন্য লোকটা কখনও এতদিন বাড়িতে কাজ করেনি।"

তখনই সদর দরজায় বেলটা আবার বেজে উঠল। সুমন প্রায় ছুটে দরজা খুলে দিয়ে বলল, "বাবা এসে গেছেন।"

॥ ৫ ॥

সুমনের বাবার বয়স চল্লিশের বেশি। পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে বুশশার্ট।

মাথার চুল কালো, তবে দু-একটা যেন পাকা বলে মনে হল।

বেশ শক্তসমর্থ চেহারা ভদ্রলোকের। প্রলয়ের মনে পড়ল, অনেকদিন আগে সুমন যেন একবার বলেছিল ছাত্রজীবনে তার বাবা একজন ভাল অ্যাথলিট ছিলেন।

প্রলয়কে দেখে সুমনের বাবা এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কতক্ষণ এসেছ?"

"এই তো ঘন্টাখানেক হবে।" প্রলয় ছোট্ট জবাব দিল।

সুমনের বাবাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কেমন যেন নাভসি, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। মনে হল আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি প্রায় দিশেহারা এবং বেশ ভয় পেয়েছেন।

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "আপনি যেন কোথায় গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু মিঃ খাসনবিশের কাছে। উনি থাকেন হেদোর পাশে গোয়াবাগানে। এককালে চুটিয়ে পলিটিক্স করেছেন। এখন খানিকটা ছাড়-ছাড় ভাব। তবে সরকারি মহলে বেশ জানাশোনা, মানে খানিকটা ইনফ্লুয়েন্স আছে।"

"আপনি কি ছোটদাদুর ব্যাপারেই ওঁর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন?"

"এগজাক্টলি। তুমি ঠিকই ধরেছ।" সুমনের বাবা ঈষৎ উৎফুল্ল হলেন। বললেন, "জানো, গতকাল রাত্তিরে ছোটকাকা বাড়ি ফিরছেন না দেখে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি। ঘড়ির কাঁটায় টং টং করে দশটা বাজল। অথচ ছোটকাকার দেখা নেই। কোনওদিন বাড়ি ফিরতে এত রাত্তির হয় না। তেমন কোনও কারণ থাকলে নিশ্চয় টেলিফোন করে বাড়িতে একটা খবর দিতেন। তা হলে কি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হল? এরকম সব আশঙ্কার কথা ভেবে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় রইলাম। তারপর আজ সকাল আটটা পর্যন্ত ছোটকাকা ফিরলেন না দেখে থানায় গেলাম। ওরা একটা ডায়েরি করে নিল। তবে আমাকে বলল, সম্ভবমতো সমস্ত জায়গায় খোঁজখবর নিতে। যদি কোথাও আটকা পড়ে থাকেন! তা আমি বললাম, "খোঁজাখুঁজি না করেই কি আর থানায় এসেছি?" আমার কাছে খবর হল গতকাল সন্ধের মুখে উনি স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়ান। সঙ্গে ওঁর এক বন্ধু ছিল। তিনি বালিগঞ্জে যাওয়ার একটা বাস ধরে উলটো মুখে চলে যান। ছোটকাকা তখনও স্টপে দাঁড়িয়ে। ব্যস, তারপর থেকেই মানুষটা নিপাত্তা।"

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ছোটদাদুর সঙ্গে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছেন?"

"নিশ্চয়। নইলে আর কেমন করে এসব জানলাম? গতকাল রাত্রেই তাঁকে টেলিফোন করি। আসলে স্টুডিয়োটা সেই ভদ্রলোকের। ওখানে বসেই ছোটকাকা ছবি-টবি আঁকেন, কাজ করেন।"

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "থানার অফিসার আপনাকে আর কিছু বলল?"

"হ্যাঁ, বলল লালবাজারে মিসিং স্কোয়াডে একটা খবর দিতে। তাতে আরও ভাল ফল হবে।"

"আপনি কি খবর দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, খবর পাঠানো হয়েছে। আসলে গোয়া বাগানে আমার সেই বন্ধুর কাছে এজন্যই গিয়েছিলাম। সমস্ত কিছু শুনে ও তখনই লালবাজারে ফোন করল। পুলিশ অবশ্য কেসটা টেক আপ করেছে। কিন্তু ও যা বলল তাতে আমি আর খুব বেশি ভরসা পাচ্ছি না।"

"আপনার সেই বন্ধু ভদ্রলোক কী বললেন?" প্রলয় জিজ্ঞেস করল।

"টেলিফোনে ওর সঙ্গে কী কথা হল জানি না। তবে শুনলাম মিসিং স্কোয়াডের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নাকি লাইনটা ধরেছিলেন। আমার বন্ধু পরে বলল, ইদানীং এরকম নিরুদ্দেশের খবর লালবাজারে হামেশাই আসে। এরা প্রায় সকলেই টিন-এজার কিংবা অবসরভোগী। টিন-এজাররা বেশিরভাগই বোম্বাই পাড়ি দেয়। রুপোলি পরদার হাতছানিতে। কেউ-বা পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে কিছুদিনের জন্য ডুব দিয়ে থাকে, এদিক-সেদিক ভেসে বেড়ায়। তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়: মা কিংবা গুরুজনস্থানীয়া অন্য কেউ শয্যাশায়ী। কিংবা জননী অঞ্জল ত্যাগ করেছেন। সুতরাং অবিলম্বে বাড়ি ফিরে এসো। তারপর অবশ্য সকলেই ফেরে। আবার স্কুল-কলেজে যায়, স্বাভাবিক জীবন শুরু করে।"

"আর অবসরভোগী, মানে বয়স্করা?" প্রলয় প্রশ্ন করল।

"এঁরাও নিরুদ্দেশ হন। তার অনেক কারণ। জীবনে অবসাদ, হতাশা, রোগব্যাধি। কারও গৃহে সমাদরের অভাব। অনেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন, সংসারের বাড়তি বোঝা বলে মনে করেন।"

"কিন্তু ছোটদাদু তো ঠিক তেমন নন। উনি রিটায়ার করেছেন সত্যি। তবে এখনও শক্তসমর্থ, কাজকর্ম নিয়ে আছেন। তা ছাড়া আমি যতটুকু জানি তাতে এ-বাড়িতে ওঁর মর্যাদার হানি হয়েছে এমন কথা অতি বড় শত্রুও বলবে না।"

"হ্যাঁ, সেটুকুই ভরসা বলতে পারো। আমি তো মিঃ খাসনবিশকে জানিয়ে এলাম ছোটকাকার নিরুদ্দেশের পেছনে তেমন কোনও কারণ থাকতেই পারে না। আসলে এ হল একটা গভীর চক্রান্ত। কোনও দলের কাজ। ছোটকাকাকে তারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।"

প্রলয় বলল, "এরকম একটা সন্দেহ অবশ্য হতে পারে। বিশেষ করে বাড়িতে অন্তত দু'বার চুরির ঘটনার পর। তা ছাড়া ছোটদাদুর নামে একটা সাঙ্ঘাতিক চিঠিও এসেছিল।"

"চিঠি? কী চিঠি? কোথায় পেলে তোমরা?"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হলেন।

সুমন বলল, "হ্যাঁ বাবা। চিঠিটা পেলাম ছোটদাদুর সুটকেসের ভেতর থেকে। আমি আর প্রলয় দু'জনে মিলে ওঁর ঘরের কাগজপত্র, বাক্স-প্যাটরা সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।"

চিঠিখানা প্রলয় তাকে এগিয়ে দিল।

কবিতায় চোখ বুলিয়ে সুমনের বাবা শঙ্কিত দৃষ্টিতে বললেন, "কী সাঙ্ঘাতিক কথা! ছোটকাকাকে যারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে

তারা তো দেখছি ডেঞ্জারাস লোক।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" প্রলয় সায় দিয়ে বলল, "অবশ্য যদি তারা কিডন্যাপ করে থাকে।"

সুমন অন্য চিঠির কথাও তার বাবাকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রলয় চোখ টিপে তাকে নিরস্ত করল।

ভদ্রলোক বললেন, "এই সাঙ্ঘাতিক চিঠিখানা জেরক্স করে খামসমেত কাছে পৌঁছে দিই। প্রয়োজন মনে করলে মিসিং স্কোয়াডে ওটা পাঠিয়ে দিতে পারবে।"

ইতিমধ্যে সুমনের মা তাদের চা খেতে ডাকলেন। প্রলয় বলল, "তুই বরং দু' কাপ চা মাসিমার কাছ থেকে নিয়ে আয়। চা খেতে খেতে ছোটদাদুর ঘরে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিই।"

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুমন তখনই ফিরল। বলল, "বোম্বাইয়ের এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর চিঠির কথা বাবার কাছে চেপে গেলি কেন?"

"তার নিশ্চয় একটা কারণ আছে।" প্রলয় চোখ নাচিয়ে রহস্য করল। বলল, "যোশি অ্যান্ড কোং-এর ওই চিঠিখানা আসলে একটা ক্লু। আমার বিশ্বাস, এই চিঠির সূত্র ধরেই ছোটদাদুর নিরুদ্দেশ রহস্য ভেদ করতে পারব। এখন চিঠিখানা মেসোমশাইয়ের হাতে দিলে উনি সেটি তাঁর বন্ধুর মারফত লালবাজারে পাঠিয়ে দেবেন। তা হলে আমাদের আর কী করবার রইল বল?"

সুমন ব্যাপারটা বুঝল। তবু সে মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু চিঠিখানায় তেমন কোনও ইঙ্গিত কই? যার থেকে আমরা ছোটদাদুর এই হঠাৎ নিরুদ্দেশের ক্লু পেতে পারি!"

প্রলয় ঈষৎ হেসে জবাব দিল, "ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে। যেমন ধর এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর হঠাৎ ছোটদাদুর ঠিকানার কেন প্রয়োজন হল? তারপর সেই ঠিকানা তারা এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাহায্যে আগ্রার আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। যোশি অ্যান্ড কোং এর পর ছোটদাদুকে একটি চিঠি লেখে। সেই চিঠি অবশ্য পাওয়া যায়নি। পেলে হয়তো এই নিরুদ্দেশ রহস্যের ওপর একটা আলোকপাত হত। চিঠি পেয়ে ছোটদাদু একটা জবাব লেখেন। যোশি অ্যান্ড কোং সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে তার একটি উত্তর পাঠায়। তাতে জানায় যে মিঃ ইয়েট্‌স আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় পৌঁছবেন। তার পূর্বেই অবশ্য ছোটদাদুকে এই বিষয়ে অবহিত করবে।"

সুমন বলল, "তোর কি মনে হয় বোম্বাইয়ের যোশি অ্যান্ড কোং ছোটদাদুকে আবার চিঠি লিখবে?"

"নিশ্চয়। নইলে মিঃ ইয়েট্‌সের কলকাতায় আসার খবর ছোটদাদু পাবেন কেমন করে? তা ছাড়া মিঃ ইয়েট্‌সের কোনও প্রয়োজন আছে বলেই তো যোশি অ্যান্ড কোং আগ্রা থেকে ছোটদাদুর ঠিকানা জোগাড় করেছে।"

সুমন চিন্তিত মুখে বলল, "তা হলে মিঃ ইয়েট্‌স কে? কেনই বা তিনি কলকাতায় আসছেন, এটা আমাদের জানতে হবে।"

"কিন্তু সে-খবর একমাত্র বোম্বাইয়ের যোশি অ্যান্ড কোং বলতে পারে। কলকাতায় আসার আগে মিঃ ইয়েট্‌স বোধ হয় তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছেন।" প্রলয় জবাব দিল।

সুমন বলল, "কিন্তু যোশি অ্যান্ড কোং-এর ঠিকানা তো আমরা জানি না।"

প্রলয় ঈষৎ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, "আমার কী মনে হয় জানিস? বোম্বাই থেকে যোশি অ্যান্ড কোং তোদের বাড়িতে এস. টি. ডি. কল করেছিল। সম্ভবত নামী কোনও হোটেলে মিঃ ইয়েট্‌সের থাকার কথা। সেজন্যই স্টুডিয়ো-ফেরত ছোটদাদু ওখানে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন।"

ছোটদাদুর ঘরে প্রলয় আর সুমন দু'জনেই আর-একবার ঢুকল। সুটকেস হাতড়ে অন্য কিছু পাওয়া গেল না। বইয়ের ভাঁজে কিংবা টেবিলের ওপর পাতা কাগজের নীচেও কোনও চিঠিপত্র নেই। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রলয় বাইরের দিকে তাকাল। বেলা পড়ে এসেছে। বাগানের ঝোপের মাথায় মরা রোদ্দুর। কী একটা অজানা পাখি পেছনের গাছের ঘনসন্নিবদ্ধ পাতার আড়াল থেকে একটানা ডেকে চলেছে।

প্রলয় বলল, "আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মিসিং স্কোয়াড যদি কোনও খবর দিতে পারে ভাল, নইলে···"

"নইলে কী?" সুমন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"কী আবার?" প্রলয় জবাব দিল। বলল, "যোশি অ্যান্ড কোং-এর কাছ থেকে ফের কবে চিঠি আসে তার প্রতীক্ষা করব। হয়তো-বা এস. টি. ডি. কলও করতে পারে। তা ছাড়া নতুন কিছু ঘটনাও বিচিত্র নয়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে সুমনের বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। পেছনে সুমনের মা। দু'জনেই প্রায় হতবাক, যেন এখনই এমন কিছু ঘটেছে যার সদুত্তর কিংবা ব্যাখ্যা কেউ খুঁজে পায়নি।

প্রলয় চিন্তিতমুখে বলল, "কী হয়েছে মেসোমশাই?"

"বলছি দাঁড়াও। মানে ব্যাপারটা ঠিক এখনও বুঝতে পারছি না।" ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

সুমনের মা বললেন, "জানো প্রলয়, একটু আগে কে একজন টেলিফোন করেছিল।"

সুমন বলল, "হ্যাঁ, রিং হচ্ছে আমি শুনেছি।"

প্রলয় জিজ্ঞেস করল, "কে টেলিফোন করেছিল?"

সুমনের বাবা একটা চেয়ারে বসে যেন দম নিলেন। ভদ্রলোককে রীতিমত চিন্তিত, একটু ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল। প্রায় কুড়ি সেকেন্ড পরে তিনি মুখ খুললেন। বললেন, "টেলিফোনটা কে করেছিল জানি না। নামও বলেনি। আমি রিসিভার ধরে 'হ্যালো' বলতেই সে প্রশ্ন করল, 'ইজ ইট থ্রি সেভেন টু জিরো টু ফোর?'"

"এটাই তো আপনাদের টেলিফোন নম্বর?" প্রলয় যোগ করল।

"হ্যাঁ, সে-কথা ফোনে জানাতেই লোকটা স্পষ্ট জিজ্ঞেস করল,

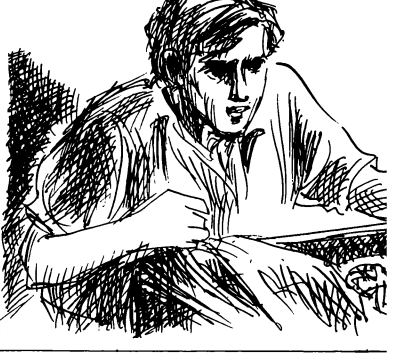

"আপনি কি সত্রাজিৎ বসুর ভাইপো ?"

"সত্রাজিৎ বসু মানে ছোটদাদু, তাই না ?" প্রলয় ভুরু তুলে তাকাল।

সুমনের বাবা বললেন, "টেলিফোনে ছোট্কার নাম শুনেই আমি রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি। তবে কি লালবাজার থেকেই কোনও খারাপ খবর দিচ্ছে ? সত্রাজিৎ বসু মানে ছোট্কার কি ওরা খোঁজ পেয়েছে ? আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, উনি আমার ছোট্কাকা। কিন্তু তিনি এখন কোথায় ? আর আপনিই বা কে কথা বলছেন ?"

প্রলয় বলল, "ফোনটা নিশ্চয় লালবাজার থেকে করেনি ?"

"ডেফিনিটলি নট।" সুমনের বাবা যেন হলফ করে বললেন। "আসলে টেলিফোনটা কে করছে তাই সে জানাল না। শুধু গম্ভীর গলায় বলল, "সত্রাজিৎবাবু এখন আমাদের কাছে আছেন। এই নিয়ে অকারণ হইচই কিংবা পুলিশের কাছে ছোটাছুটি করে লাভ নেই। বরং সেটা তাঁর ক্ষতির কারণ হতে পারে।'"

"তারপর ?" বাকিটুকু শোনার জন্য প্রলয় সাগ্রহে তাকাল।

কিন্তু সুমনের বাবা তাকে সম্পূর্ণ হতাশ করলেন। একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করে বললেন, "লোকটা আর কোনও কথাই বলল না। ঝপ করে টেলিফোনটা নামিয়ে লাইনটা কেটে দিল।"

সুমন বলল, "ছোটদাদু তা হলে এখন বন্দি। লোকগুলো তাকে কব্জা করে ফেলেছে।"

প্রলয় বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করো। লোকগুলো ছোটদাদুর মুক্তির জন্য কোনও শর্ত আরোপ করেনি।"

"কী শর্ত আরোপ করত ?" সুমনের বাবা প্রশ্ন করলেন।

"কেন ?" প্রলয় চটজলদি জবাব দিল। "সেই পুরনো জিনিসটা, যার জন্য দু'বার বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে, ওরা সেটা দাবি করতে পারত।"

"কিন্তু সেই পুরনো জিনিসটা কী, তাই তো আমরা জানি না। আর সেটা কোথায় আছে তাও বলতে পারব না।" সুমন উত্তর দিল।

প্রলয় বলল, "টেলিফোনের কথা শুনে একটা সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, ছোটদাদু এই কলকাতাতেই কোথাও আছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর ক্ষতি কিংবা বিপদের কারণ ঘটেনি। আমরা পুলিশে খবর না দিলে হয়তো সে আশঙ্কাটাও থাকবে না।"

সুমনের বাবা বললেন, "কিন্তু টেলিফোনের খবরটা আমাদের পুলিশে জানানো উচিত।"

প্রলয় ঈষৎ হেসে জবাব দিল, "না মেসোমশাই, এখন থানা-পুলিশকে কিছু জানাতে গেলে হয়তো ছোটদাদুর কোনও বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া টেলিফোনে ওরা তো কোনও ভয় দেখায়নি। শুধু খবর দিয়েছে ছোটদাদু এখন তাদের হেফাজতে। বরং আমরা ধরে নিতে পারি, ছোটদাদু এখনও ভালই আছেন। দু-চারদিন পরে তাঁকে ওরা মুক্তি দিতে পারে।"

চোখমুখের দিকে তাকিয়ে সুমনের বাবার ভয় কেটেছে বলে মনে হল না। কিন্তু এর বিকল্প যা, তার ফলাফলও সাঙ্ঘাতিক ভেবে ভদ্রলোক আর একটি কথাও বললেন না।

সুমনের মা হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, ওরা তো আবার টেলিফোন করতে পারে ?"

"ঠিক মাসিমা।" প্রলয় তাঁকে সমর্থন জানাল। বলল, "শুধু টেলিফোন নয়। ইতিমধ্যে হয়তো কোনও চিঠিপত্র আসবে, যার থেকে ছোটদাদুর এই অন্তর্ধান রহস্যের একটা কিনারা হওয়া সম্ভব।"

বিকেল নাগাদ প্রলয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, সুমন সঙ্গে। দু'জনে হাঁটতে-হাঁটতে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। বেলা পড়তেই লাবণি হাউসিং এস্টেট থেকে লোকজন বেরিয়ে পথে ঘুরছে। এই অপরাহ্নে সল্ট লেকের রূপই আলাদা। মনোহর বলা চলে।

সুমন জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয় ছোটদাদুকে সেই শয়তানের দল আটক করে রেখেছে ?"

"আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে।" প্রলয় জবাব দিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল, "শুধু একটা জায়গায় এসে আমার খটকা লাগছে।"

"খটকা কিসের ?" সুমন জিজ্ঞেস করল।।

প্রলয় বলল, "মেসোমশাইকে যারা টেলিফোন করেছিল তারা মিছিমিছি কেন বাড়িতে খবর দিতে গেল ? ছোটদাদুকে আটক করে রেখেছে, এই খবরটা বাড়িতে জানালেই তারা থানা-পুলিশ করবে। তাতে গোটা দলটারই ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে।"

সুমন বলল, "কিন্তু ওরা তো থানা-পুলিশ করতে নিষেধ করেছে।"

"নিষেধ যদি কেউ না শোনে, তা হলে ? তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে বাড়ির লোকে কখনও হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে ?"

সুমন বলল, "তোর কি মনে হয় যারা এ-বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল তারা ছোটদাদুকে আটক করেনি ?"

"যদি তাই হয়," প্রলয় জিজ্ঞাসু হল। বলল, "তা হলে ছোটদাদুকে আবার কারা কিডন্যাপ করল ? কী তাদের স্বার্থ ?"

একটা এসপ্ল্যানেডগামী বাস লাবণির স্টপে এসে দাঁড়াতেই প্রলয় গেটের দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে সুমন বলল, "কাল স্কুলে দেখা হবে, কেমন ?"

"ঠিক আছে।" বলেই প্রলয় তাড়াতাড়ি পাদানি বেয়ে বাসের ভেতরে অদৃশ্য হল।

বাড়ি ঢুকতেই তার মা বললেন, "সমস্ত দিন ছিলি কোথায় ? সেই দুটি খেয়ে বেরিয়েছিস, আর এখন সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরলি ?"

"সল্ট লেকে সুমনদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম মা।" প্রলয় জবাব দিল।

"ভরদুপুরে হঠাৎ ওদের বাড়ি গেলি যে ? সুমন তোকে ডেকে

পাঠিয়েছিল ?"

প্রলয় বলল, "আসলে ওদের বাড়িতে ফের একটা ঘটনা হয়েছে। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত, বুঝলে ?"

"কী ঘটনা তাই না বললে আমি বুঝব কেমন করে ?" প্রলয়ের মা ভুরু কোঁচকালেন।

প্রলয় বলল, "ওদের বাড়িতে দু'বার চোর এসেছিল এটা নিশ্চয় শুনেছ ?"

"দু'বার কখন এল ? তুই তো বলেছিলি রাতদুপুরে কালো পোশাক পরা একটা ভূতের মতো লোক বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।"

"সেটা প্রথমবার। তারপর ওদের বাড়িতে আর-একবার চুরি হয়েছে। দিনদুপুরেই বলতে পারো। একটা লোক দিন পনেরো আগে বাড়িতে কাজে লেগেছিল। সে-ই ওর ছোটদাদুর সুটকেস ভেঙে চুরি করে।"

"নিশ্চয় দামি জিনিসপত্র খোওয়াগেছে ?"

"না, লোকটা তেমন কিছু নিয়ে পালায়নি। শুধু একটা পুরনো রিস্টওয়াচ। ছোটদাদুর সুটকেসেই সেটা ছিল।"

"ওমা, এ আবার কেমনধারা চুরি ! একটা পুরনো হাতঘড়ি বেচে ও আর ক'টা টাকাই বা পাবে ?"

"তা ঠিক। তবে চুরিটা সামান্য বলেই ব্যাপারটা যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। তারপর যা ঘটল সেটা অনেক বেশি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। চুরির পরদিন ছোটদাদু হঠাৎ নিরুদ্দেশ। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"নিরুদ্দেশ মানে ?" প্রলয়ের মায়ের চোখ দুটো প্রায় গোল হয়ে উঠল।

প্রলয় বলল, "দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে উনি স্টুডিয়োতে যেমন যান তেমনই গিয়েছিলেন। সন্ধের মুখে স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়ান। ব্যস, তারপর থেকেই ওঁর আর কোনও হদিস নেই।"

"বলিস কী ? ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ? সুমনের বাবা পুলিশে খবর দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, সে-বিষয়ে কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু পুলিশ আর কী করবে ? অমন কত মিসিং কেস লালবাজারে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে।"

"বুঝেছি।" প্রলয়ের মা চোখ ঘুরিয়ে বলল, "তুমি তা হলে সেই নিরুদ্দেশ রহস্যের কিনারা করতে গিয়েছিলে ? অথচ সামনে তোমার টেস্ট পরীক্ষা। এখন মাথায় গোয়েন্দাগিরির পোকা ঢুকলে পড়াশোনার কথা আর মনে থাকবে ?"

প্রলয় হেসে বলল, "বা রে, আমি আবার গোয়েন্দাগিরি করতে গেলাম কোথায় ? সুমনদের বাড়িতে অমন বিপদ। তাই একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ। সেই কথা মনে রেখো। ওসব ফালতু কাজে নিজেকে আর জড়িয়ো না।"

পরদিন স্কুলে যেতেই সুমন বলল, "কাল রাত্তিরে আবার এক কাণ্ড হয়েছে।"

"কী কাণ্ড ? ছোটদাদু ফিরে এসেছেন ?"

"নাহ, বাড়িতে ফের চোর এসেছিল।" সুমন একটা অবসন্ন ভঙ্গি করল।

"চোর এসেছিল কখন ? এবার কী নিয়ে গেছে ?" প্রলয়-সাগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমন বলল, "কত রাত্তিরে চোর এসেছিল তা কেউ বলতে পারব

না। তবে রাত্তির দেড়টা নাগাদ একবার পাড়ার কুকুরগুলো প্রায় একসঙ্গে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠেছিল। চোরটা হয়তো তখনই পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়েছে।"

"কিন্তু এবার জিনিসপত্র কী চুরি গেল, বাড়ির কোন ঘরে চোর ঢুকেছিল ?"

"ছোটদাদুর ঘরে।" সুমন ঈষৎ হেসে বলল, "এবারও জিনিসপত্র সব তছনছ, লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। কিন্তু আশ্চর্য ! একটা জিনিসও নিয়ে যায়নি। বরং যাওয়ার আগে ঘরের মেঝেতে সেই পুরনো রিস্টওয়াচটা ফেলে দিয়ে গেছে।"

প্রলয় খুব অবাক হয়ে বলল, "পুরনো রিস্টওয়াচ, মানে ছোটদাদুর সুটকেস থেকে যে হাতঘড়িটা চুরি হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ রে ! সকালে মেঝের ওপর ওই হাতঘড়িটাকে পড়ে থাকতে দেখে বাবা-মা দু'জনেই যাকে বলে অবাক ! এই চুরির পেছনে কী যে রহস্য রয়েছে তা আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারছি না।"

প্রলয় বলল, "তোদের বাড়িতে ফের চোর এসেছিল শুনে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে।"

"কী বলছিস ?" সুমন চোখ পাকিয়ে তাকাল।

"রাগ করিস না।" প্রলয় মুচকি হেসে বলল, "বারবার চোর যে বাড়িতে হানা দিচ্ছে তার একটাই কারণ। এই বাড়িতে এমন কোনও একটা জিনিস আছে যার সাহায্যে রাতারাতি ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। সাধু-সন্নিসি সেজে যারা এসেছিল, যারা কবিতার চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখিয়েছে কিংবা ভৃত্য সেজে যে-লোকটা তোদের বাড়িতে ছিল, তারা সবাই মনে হয় একই দলের লোক। এরা ওই বস্তুটি হস্তগত করবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে।"

"কিন্তু এরকম কোনও জিনিসের কথা আমরা বিন্দুবিসর্গও জানি না। ছোটদাদু হয়তো জানতে পারেন। কিন্তু বাবা কিংবা মা কাউকে তিনি এর আভাস পর্যন্ত দেননি।"

"আমারও সেটা মনে হয়। ব্যাপারটার সঙ্গে ছোটদাদু জড়িত। তাই প্রতিবারই ওঁর ঘরে চোর হানা দিয়েছে। তবে ঈপ্সিত বস্তুটি খুঁজে পায়নি।"

"কিন্তু ছোটদাদু তো নিখোঁজ। কোথায় আছেন, কেমন আছেন তাও কেউ জানে না। শুধু টেলিফোনে একটা উড়ো খবর এসেছে, সত্রাজিৎ বসু, মানে ছোটদাদু তাদের হেফাজতে রয়েছেন। আবার ছোটদাদু যদি তাদের খপ্পরেই পড়ে থাকেন, তা হলে রাতদুপুরে তাঁর ঘরে চোর কেন ঢুকতে গেল ? তবে কি সেই জিনিসটা ঘরে কোথাও

লুকনো আছে তার সুলুক-সন্ধান ছোটদাদু ওদের বলে দিয়েছেন ?"

প্রলয় মাথা নাড়ল। বলল, "আমার কী মনে হয় জানিস ? ছোটদাদু ওদের খপ্পরে নেই। আর সেজন্যই ওরা এখনও চুরির মতলবে তোদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে। কিন্তু জিনিসটা কোথায় লুকনো আছে সেটা এখনও জানতে পারেনি বলেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য ! ছোটদাদু তা হলে এখন কোথায় ? কারা ওঁকে আটক করে রেখেছে ?"

"সেটাই তো রহস্য !" প্রলয় গভীরভাবে কী চিন্তা করছিল। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল, "যোশি অ্যান্ড কোং-এর প্রথম চিঠিখানা হাতে পেলেই ব্যাপারটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যেত।"

সুমন বলল, "এখনই তার কোনও সম্ভাবনা নেই। বোম্বাই থেকে যোশি অ্যান্ড কোং যদি ফের চিঠিপত্র লেখে, তা হলে হয়তো ওদের ঠিকানাটা জানা যেতে পারে।"

প্রলয় হঠাৎ সহর্ষে বলে উঠল, "আচ্ছা, যোশি অ্যান্ড কোং-এর দ্বিতীয় চিঠিখানার তারিখ তো সাতই অগস্ট, তাই না ?"

"তাই বোধ হয়। চিঠির মাথায় তারিখটা লেখা ছিল।" সুমন জবাব দিল।

প্রলয় বলল, "তারিখটা যদি তা-ই হয় তা হলে আজ হল তিরিশে অগস্ট। তার মানে মিঃ ইয়েট্‌সের কলকাতায় এসে পৌঁছতে আর মাত্র চার-পাঁচদিন বাকি।"

"এগজাক্টলি। তুই তো ঠিক ধরেছিস।" সুমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

প্রলয় বলল "আমার ধারণা' আজ-কাল-পরশুর মধ্যেই বোম্বাই থেকে যোশি অ্যান্ড কোং-এর চিঠি আসবে। কিন্তু সাবধান, পত্রখানি যেন মেসোমশাইয়ের হাতে না পড়ে।"

সুমন বলল, "বাবা কিন্তু লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। মনে হয় সেই কবিতা, তারপর টেলিফোনের উড়ো খবরও তিনি গোয়াবাগানের বন্ধুর কাছে ফাঁস করেছেন।"

"তুই কেমন করে জানলি ?"

সুমন বলল, "আজ সকালেই আমাদের বাড়িতে একজন প্লেন-ড্রেস পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। সত্যি কথা বলতে আমি ওঁর পরিচয়টা বুঝতেই পারিনি। ভদ্রলোক প্রায় মিনিট পনেরো বাবার সঙ্গে কীসব আলোচনা করলেন। উনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই মাকে ডেকে বাবা সব কথা বলে দিলেন।"

"পুলিশ কি ছোটদাদুর কোনও খোঁজ পেয়েছে ?"

"উঁহু।" সুমন একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করল। বলল, "পুলিশ অফিসারটি জানতে এসেছিলেন ইদানীং ছোটদাদু কোথায় যেতেন, কাদের সঙ্গে মিশতেন, এ-বাড়িতে কারা সম্প্রতি তাঁর কাছে এসেছে, এসব প্রশ্নই বেশি করেছেন।"

"গতরাত্রে তোদের বাড়িতে যে চোর এসেছিল, আগের বারের চুরি যাওয়া রিস্টওয়াচটা ফের মেঝেতে ফেলে দিয়ে গেছে, মেসোমশাই নিশ্চয় সে-কথা গোপন করেননি ?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে বাবা এসব কথা মাকে জানাননি।"

প্রলয় বলল, "উপায় নেই। আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। তার মধ্যে একটা খোশখবর নিশ্চয় মিলবে।"

"কিন্তু মা যে বড্ড ভেঙে পড়েছেন। দিনরাত্তির কেমন মনমরা হয়ে থাকেন। ছোটদাদুর কী হল, তাই নিয়ে চিন্তা করেন।"

"মাসিমাকে বলিস, দুশ্চিন্তার বোধ হয় কোনও কারণ নেই। ছোটদাদু হয়তো বহাল-তবিয়তেই আছেন।" প্রলয় ঈষৎ হাসল।

"তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই। মা এ-কথা শুনলে খুব শান্তি পাবেন।" সুমনকে এবার বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল।

দিন-দুই পরেই সুমন হঠাৎ টেলিফোন করল। সকাল ন'টা হবে। প্রলয়ের বাবা একটু আগেই অফিস গেছেন। মা তখনও রান্নাঘরে। স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রলয় তার বইপত্তর গোছাচ্ছিল। টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভারটা তুলে বলল, "হ্যালো।"

অন্য প্রান্ত থেকে সুমন জবাব দিল, "দারুণ খবর, বুঝলি ?"

"খবরটা কী ?" প্রলয় চটজলদি জানতে চাইল।

ভনিতা না করে সুমন বলল, "একটু আগেই বোম্বাই থেকে যোশি অ্যান্ড কোং টেলিফোন করেছিল।"

"তাই নাকি ?" প্রলয় জিজ্ঞাসু হল। জিজ্ঞেস করল, "নিশ্চয় ছোটদাদুর খোঁজ করছিল ?"

"অফ কোর্স।" টেলিফোনে পরিষ্কার জানাল, "এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং, স্পিকিং ফ্রম বম্বে। উই ওয়াণ্ট মিঃ সত্রাজিৎ বসু।"

"তুই কী জবাব দিলি ?"

"বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, ছোটদাদু একটু বাইরে গেছেন। আপনাদের অফিসের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা জেনে রাখতে বলেছেন। তা ওরা কোনও আপত্তি না করে তখনই সব জানিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, নিজেরাই বলল, তেমন দরকার থাকলে ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে কোনও চিঠি পাঠালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার জবাব পেয়ে যাব। ওদের ফ্যাক্স নম্বরটাও সেইসঙ্গে বলে দিয়েছে।"

"ওয়েল ডান।" প্রলয় তাকে উৎসাহিত করল। বলল, "যোশি অ্যান্ড কোং-এর তা হলে ফ্যাক্স মেশিন আছে !"

"তাই তো মনে হয়।" সুমন জবাব দিল।

প্রলয় বলল, "স্কুলে আয়। ইতিমধ্যে ভেবেচিন্তে একটা প্ল্যান আমি তৈরি করে ফেলছি।"

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই দু'জন স্কুলের পেছনে একটা পেয়ারা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। প্রলয় বলল, "এই চিঠিখানা পড়ে দ্যাখ।"

"চিঠি ? কী চিঠি আবার ?" কাগজখানা চোখের সামনে মেলে সুমন দ্রুত পড়তে শুরু করল। চিঠিতে লেখা :

মেসার্স এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং,বম্বে

মহাশয়,

আপনার টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ। ওই সময়ে আমি বাহিরে

ছিলাম বলিয়া ফোনে কথা হয় নাই। এখন জানাই যে, আমাকে লেখা আপনাদের প্রথম পত্রখানির একটি অনুলিপি পাঠাইলে ভাল হয়। মিঃ ইয়েটসের সঙ্গে দেখা করিবার সময় ওই পত্রটি থাকিলে আত্মপরিচয় দিতে সুবিধা হইবে। মিঃ ইয়েটস কবে আসিবেন এবং কোথায় থাকিতে মনস্থ করিয়াছেন, জানাইতে ভুলিবেন না।

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
সত্রাজিৎ বসু

সুমন জিজ্ঞেস করল, "চিঠিখানা বোম্বাই পাঠাবি ?"

"হ্যাঁ।"

"বাই মেল ?"

"কোন দুঃখে ? একটু আগেই তো বললি ওদের ফ্যাক্স মেশিন আছে।"

"কিন্তু চিঠি পাঠাতে তুই ফ্যাক্স পাবি কোথায় ?"

"কেন ?" মুচকি হেসে প্রলয় জবাব দিল, "বাবার অফিসে ফ্যাক্স আছে। চিঠিখানা সেখান থেকেই পাঠানো যাবে।"

পরদিন সকালেই প্রলয় বাবাকে জানাল, সুমনের ছোটদাদু বোম্বাইয়ে একটা চিঠি পাঠাতে চান। চটপট, মানে আজই জবাব এলে ভাল। তাই যদি অফিস থেকে ফ্যাক্সের একটা ব্যবস্থা করা যেত তা হলে উনি খুবই খুশি হতেন।

প্রলয়ের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "চিঠিটা খুবই জরুরি ?"

"হ্যাঁ, মানে উনি তাই বলেছেন।" প্রলয় বলল।

"যেখানে চিঠি পাঠাতে হবে তাদের ফ্যাক্স নম্বরটা জানো ?"

"হ্যাঁ।" প্রলয় ঘাড় হেলিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গি করল।

"তোমাদের স্কুল তো আজ ছুটি ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তা হলে বেলা দুটো নাগাদ তোমার সেই বন্ধুকে নিয়ে চলে এসো। উত্তরটা ও-ই নিয়ে যেতে পারবে।"

ঘড়িতে দুটো বাজবার আগেই প্রলয় তার বাবার অফিসে হাজির। সুমন সঙ্গে। প্রলয়ের বাবা একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছিলেন। ছেলের সঙ্গে সুমনকে দেখেই বললেন, "আরে এসো। তোমার দাদুর সেই চিঠির উত্তর কখন এসে গেছে।"

একটা মুখ বন্ধ-করা খামের ভেতর উত্তরটা আছে। প্রলয় আগেই বন্ধুকে বলে রেখেছিল রিপ্লাইটা হাতে পেয়ে যেন বেশি কৌতূহল না প্রকাশ করে। তাতে বাবার মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।

খামটা হাতে নিয়েই সুমন বলল, "ওয়ান্ডারফুল। কত তাড়াতাড়ি জবাবটা এসে গেল।"

প্রলয়ের বাবা বললেন, "ফ্যাক্সের তো ওটাই সুবিধে। চিঠির কথা বাদ দাও। সে ইচ্ছে করলে টেলিফোনেও জেনে নিতে পারো। কিন্তু ধরো একটা স্কেচ প্ল্যান, ডিজাইন, কিংবা একটা লম্বা পরিসংখ্যান পাঠানো প্রয়োজন। ফ্যাক্সের ভেতরে দিলে হুবহু তারা পেয়ে যাবে।"

সুমন জিজ্ঞেস করল, "ফ্যাক্সের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন মেসোমশাই ?"

ভদ্রলোক বললেন, "মোটামুটি জেনে রাখো, ফ্যাক্সের সঙ্গে টেলিফোন লাইনের একটা কানেকশন করা আছে। যে চিঠিটা পাঠালাম সেটা মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে টেলিফোনে ফ্যাক্স নম্বরটা ডায়াল করলাম। লাইন পাওয়া যেতেই ফ্যাক্স তার কাজ শুরু করল। অর্থাৎ এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোংয়ের মেশিনে হুবহু এই চিঠি পৌঁছে গেল। ওরা আবার চিঠির জবাব তৈরি করে আমাদের ফ্যাক্স নম্বরে ডায়াল করল। ব্যস, আমাদের ফ্যাক্স মেশিনে চিঠির কপি এসে গেল।

প্রলয় বলল, "আমরা তা হলে এখন আসি বাবা, চিঠি নিয়ে সুমনকে তো আবার সল্ট লেকে যেতে হবে।" সে ভালমানুষের মতো তাকাল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসো তোমরা।" ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন।

পার্ক স্ট্রিট ধরে খানিকটা হেঁটে প্রলয় একজায়গায় দাঁড়াল। খামের মুখটা ছিঁড়ে জবাবটা পড়তে শুরু করল। চিঠির প্রথমেই দু' লাইন লেখা। মিঃ ইয়েট্স আগামী পরশু সকালের ফ্লাইটে কলকাতা পৌঁছবেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাঁর ওঠার কথা। তারপর প্রথম চিঠির অনুলিপি।

দ্রুত চিঠি পড়েই প্রলয় সহর্ষে বলে উঠল, "ইউরেকা। এতক্ষণে বুঝতে পারছি লোকগুলো ছোটদাদুর ঘরে কেন বারবার হানা দিয়েছে।"

চিঠিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সুমন বলল, "মাই গড ! এই তা হলে সেই পুরনো জিনিস ?"

প্রলয় বলল, "ব্যাপারটা অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়। ধর, ওই সামান্য বস্তুটির দাম হয়তো কয়েক লক্ষ টাকা হবে।"

"খেপেছিস ?" সুমন হেসে উঠল। পরে বলল, "আমি ভাবছি ছোটদাদু গেলেন কোথায় ? মিঃ ইয়েটসের কলকাতায় আসার খবরটা তিনি পাবেন কেমন করে ? লোকগুলো যে তাঁকে কোথায় আটকে রেখেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না।"

ঈষৎ গম্ভীর মুখে প্রলয় বলল, "আবার এমনও হতে পারে ছোটদাদুকে কেউ আটক করে রাখেনি। হয়তো আজকালের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন।"

পরদিন রাত্তির দশটা নাগাদ প্রলয়দের টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সে 'হ্যালো' বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "দি ইয়ার অব দি ব্যাট্‌ল অব ট্রাফল্‌গার ?"

"ইয়েস সার, দিস ইজ ওয়ান এইট জিরো ফাইভ,—দি ইয়ার অব দি ব্যাটল অব ট্রাফল্‌গার। কিন্তু আপনি কোথা থেকে বলছেন ?"

"পৃথিবী নামের একটি গ্রহ থেকে।" কণ্ঠস্বর ফের শোনা গেল।

প্রলয় বলল, "আপনি গা-ঢাকা দিয়েছেন সেটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম।"

"কেমন করে ?"

"নইলে টেলিফোনে খবর দিতেন না যে, আপনি একজায়গায় আছেন। অনর্থক হইচই কিংবা পুলিশে খবর দিয়ে লাভ নেই। অবশ্য এ ছাড়া আপনার উপায় ছিল না।"

"কারণ ?"

"কারণ মিঃ ইয়েট্সের কলকাতায় এসে পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। অথচ সল্ট লেকের বাড়িতে বারবার চোরের উপদ্রব। বলা যায় না সেই লুকনো জিনিসটা খোওয়া যেতে পারত।"

"ভেরি গুড। তোমার অনুমান সঠিক, খুদে ডিটেকটিভ। তুমি আর কিছু বলবে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে জানাচ্ছি মিঃ ইয়েট্স আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে দমদমে পৌঁছবেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাঁর ওঠার কথা।"

"জানি। তুমি যে ফ্যাক্সের সাহায্যে প্রথম চিঠির কপিটা জোগাড় করেছ, সে-খবরও পেয়েছি।"

"কেমন করে জানলেন ?"

"কেন ? গতকাল দুপুরে বোম্বাইয়ে টেলিফোন করেছিলাম যে। তার একটু আগেই ওরা কলকাতার একটা অফিসের ঠিকানায় ফ্যাক্স পাঠিয়েছে। পরে জানলাম ওটা তোমার বাবার অফিস।"

"তা হলে মিছিমিছি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন কেন ? রহস্য যখন ফাঁস হয়ে গেছে। বরং বাড়ি চলে আসুন। মেসোমশাইকে খবরটা এখনই জানিয়ে দিই ?"

"আরে, না, না, সে-সময় তো এখনও হয়নি। আগে মিঃ ইয়েট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বটা শেষ হোক। তারপর বাড়ি যেতে অসুবিধে নেই। কিন্তু তার আগে তোমার যে একটু সাহায্য চাই।"

"কী সাহায্য চাই বলুন ?" প্রলয় সাগ্রহে জানতে চাইল।

"আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় আমি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ঢুকব। হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ থাকবে। কিন্তু ঢোকার মুখে আমার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। হয়তো ফোলিও ব্যাগটা ছিনতাই হতে পারে।"

"তা হলে লালবাজারে টেলিফোন করে পুলিশের হেল্প চাইছেন না কেন ?"

"ধুর, ওসব থানা-পুলিশ আমার ধাতে সয় না। তা ছাড়া এ তো মশা মারতে কামান দাগা। তার চেয়ে বরং সুমনকে নিয়ে তুমি হোটেলের গেটের সামনে অপেক্ষা কোরো। প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে।"

বিকেল পাঁচটার মিনিট দুই-তিন পরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দরজায় একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। হাতে একটা ছোট ফোলিও ব্যাগ। চতুর্দিকে অফিস ছুটির ভিড়। অগুনতি লোক উত্তর-দক্ষিণে যাচ্ছে-আসছে। ভদ্রলোক দু' পা এগোতেই মনে হল কেউ তাঁকে আচমকা সজোরে ধাক্কা মারল। মুহূর্তে ফোলিও ব্যাগটা হাতছাড়া। ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে "ব্যাগ, আমার ব্যাগ" বলে চেঁচামেচি শুরু করেছেন। আর ঠিক তখনই ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে ক্ষিপ্রগতিতে দু' হাত বাড়িয়ে সেই ছিনতাইকারীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বমালসুদ্ধু লোকটা সটকে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে জনতা তাকে ঘিরে ফেলেছে। তারপর যা হয়! প্রথমে গণপ্রহার, শেষে অবশ্য পুলিশ এসে লোকটাকে উদ্ধার করে ভ্যানে তুলল। জনতা প্রলয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য তাকে বাহবা দিতে লাগল।

গাড়ি ছাড়ার আগে পুলিশ অফিসার বলে গেলেন, "আপনি একবার থানায় আসবেন। ব্যাটাকে যখন পাকড়াও করেছি তখন ওর মুখ থেকেই দলের সব কথা সুড়সুড় করে বেরোবে।"

"কিন্তু আমার ফোলিও ব্যাগটা ? ওতে সব কাগজপত্র আছে।" ছোটদাদু বললেন।

"ওটা থানায় গেলেই পাবেন।" পুলিশ অফিসার তাঁকে আশ্বস্ত করে গাড়িতে উঠল।

সুমন বলল, "কিন্তু ছোটদাদু, ফোলিও ব্যাগে তোমার সেই পুরনো জিনিসটা রয়ে গেল না তো ?"

মুচকি হেসে প্রলয় বলল, "পুরনো জিনিসটা কোথায় আছে আমি জানি।"

ছোটদাদু তার মুখের দিকে তাকাতেই প্রলয় সরব হল, "ওটা আপনার কোমরের কাছে ধুতির খুঁটে বাঁধা আছে। ট্যাক্সি থেকে নামার সময়েই সেটা টের পেয়েছি।"

প্রলয়ের পিঠে একটা সস্নেহ চাপড় মেরে ছোটদাদু বললেন, "নটি বয়, সবদিকে ঠিক নজর আছে তোমার।"

সুমন তাড়াতাড়ি বলল, "ওটা একবার দেখাও না ছোটদাদু।"

"উঁহুঁ। এখানে নয়।" ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। বললেন, "বরং হোটেলের ভেতরে চলো। মিঃ ইয়েট্‌সের সামনে ওটা বের করলেই দেখতে পাবে।"

একটা ঠাণ্ডা ঘরের ভেতরে মিঃ ইয়েট্‌স অপেক্ষা করছিলেন। ছোটদাদু নিজের নাম এবং এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর কথা বলেই ধুতির একটা প্রান্ত খুলে বস্তুটি বের করলেন।

মিঃ ইয়েট্‌স সেটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন "হ্যাঁ, Patek Phillippe moon phase, —আঠারো ক্যারাট রিস্টওয়াচ। রেওয়ার মহারাজা এটি বোম্বাইয়ের এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর কাছ থেকে কিনেছিলেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাজার বাবার একটা সুন্দর অয়েল পেন্টিং করেছিলাম বলে উনি এই ঘড়িটা আমাকে গিফ্‌ট দিয়েছিলেন। অনেকেই সেটা ভাল চোখে নেয়নি। তারপর এত বছর বাদে কলকাতায় সল্ট লেকের বাড়িতে হঠাৎ একদিন রেওয়ার একজন লোক এসে হাজির। এখনকার মহারাজার নাম করে বলল, সেই ঘড়িটা উনি ফেরত চান। প্রয়াত পিতার সমস্ত জিনিসপত্র একটা সংগ্রহশালায় রাখবেন, তাই। অবশ্য তার জন্য আমাকে দশ-বিশ হাজার টাকা নগদ দিতেও রাজি। আমি কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হইনি। তার কারণ ঘড়িটা আমার কাছে একটা মূল্যবান স্মৃতি। রিস্টওয়াচের বদলে টাকা চাইলে মহারাজা হয়তো সেটা ফেলে দিতেন। তারপর বাড়িতে চোরের উপদ্রব, শাসানি। আসলে এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর কোনও কর্মচারী মনে হয় রেওয়ার রাজবাড়ির সঙ্গে যোগাসাজশে এইসব অপকর্ম শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও কি জানতাম আপনার মতো একজন পুরনো ঘড়ির টপ ইন্টারন্যাশনাল কালেক্টর এই রিস্টওয়াচটার জন্য বোম্বাইয়ের এন. এন. যোশি অ্যান্ড কোং-এর সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করেছেন।"

মিঃ ইয়েট্‌স সহাস্যে বললেন, "এখন আর আপনার কোনও চিন্তা নেই। রিস্টওয়াচটা আমি নিলাম। আর সেজন্য এর মূল্য যা ঠিক হয়েছে সম্ভবত তা আপনি জেনেছেন।"

ছোটদাদু কোনও জবাব দেওয়ার আগেই পেছন থেকে প্রলয় বলল, "আজ্ঞে, আজকের কাগজেই তো সেটা বেরিয়েছে। একটা আঠারো ক্যারাটের রিস্টওয়াচের দাম দিচ্ছেন পাঁচ লক্ষ টাকা।"

দাম শুনে সুমন তো থ, মুখে রা নেই।

চেক বই বের করে মিঃ ইয়েট্‌স ততক্ষণে টাকার অঙ্কটা লিখতে শুরু করেছেন।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

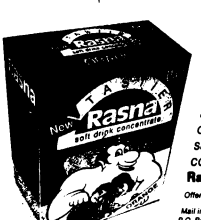

Mudra:EAMR:7261

গোয়েন্দা শার্লক হোমস্

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্র্যাঙ্ক ভকোলা

গোয়েন্দা শার্লক হোমস

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্রাঙ্ক জকোলা

আর্চি
হুম... আমি স্কুলের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, মিজ !
খুব ভাল কথা !
হুম... সঙ্গে একপ্রস্থ পোশাকও এনেছি !
যাও, মুজ ! আজ তোমার মেজাজের অনেক উন্নতি হয়েছে !
ধন্যবাদ, ডাক্তার !
I.M. DASHRINK PHD
এ কী ? মুজ স্কুলের মনস্তাত্ত্বিকের কাছে !
তুমি যদি মাথা পরীক্ষা করাতে চাও তবে তোমার মাথায় ঘিলু থাকা চাই ! খিক্ ! খিক্ !
এই ! কী হচ্ছে ?
না !
ধাই !
ধমাস !
আমাকে নামিয়ে দাও !
ধপ !
মুজ ! না !
উহ্ ! তোমাকে না বলেছিলুম রাগ হলে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করবে ?
তা-ই করেছি... রাগ হতেই রেগিকে ঘুলঘুলির মধ্যে ঝেড়ে ফেলেছি !

আর্চি
আর্চি, যা আশা করা গিয়েছিল তোমার কাঠের কাজ তার চেয়ে ভাল হয়েছে।
সত্যি বলছ, বাবা ?
নিশ্চয় ! তুমি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছ, অথচ কেউ জখম হয়নি !
আর্চি কাঠ দিয়ে কাজ করছে, বাবা !
জানি, কিন্তু ওর তো' ওই একটাই মাথা !
এটা আজেবাজে জিনিসের তাক !
তাকটাও আজেবাজে । কাজে তোমার মন নেই !
ভাঙা আসবাবের স্তূপেও এত বাজে জিনিস দেখিনি !
এই বাজে জিনিসটা নিয়ে তুমি কী করবে, আর্চি ?
আপনাকে দেব, সার । মেরি ক্রিসমাস !
ছেলেটার মাথায় কিছু নেই, কিন্তু মনটা ভাল !
12-19

গাবলু
মুখোশের বৈচিত্র্য
পরচুলা পরে বন্ধুদের বোকা বানাও
বৈচিত্র্য
তোমাকে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে, গাবলু... জুতো পালিশ করেছ, তাই না?
পরে দেখা হবে, গাবলু... চুল কাটতে যাচ্ছি।
এসো, খোকা।
হাত মুখ ধুয়ে খেতে এসো, গাবলু!

গাবলু
সবাই এসো... আমার বাবা এখনই একটা ৪০ ইঞ্চি টিভি এনেছেন।
ছেলেরা, তোমরা কি রাতের খাবার খেতে বাড়ি যাবে না?!!
এখন সবাই খেতে চলে যাও!
এবার কী?

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সাপ্তাহিক উপন্যাস

শিউলি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সবাই খেতে বসেছেন। টেবিলটা বিরাট। প্রাচীন আমলের। শিবশঙ্করের পিতা এক সাহেবের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। অনেক কারুকার্য। খুব যত্নে থাকে এ বাড়ির সব কিছু। শিবশঙ্করের দু'পাশে জয় আর জয়া। বিপরীত দিকে উদয়ন, পাশে সাহারা। রাত ন'টা। বাড়িটা খালি-খালি লাগছে। সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। উদয়ন সঙ্গে বিশেষ কিছু নিচ্ছেন না। কিছু জামাকাপড়, চাদর, প্রয়োজনীয় বই। সবই কিনে নেবেন নতুন জায়গায় গিয়ে।

নানারকমের রান্না হয়েছে আজ। বিদায় ভোজ। কেউই তেমন প্রফুল্ল মনে খেতে পারছে না। চেষ্টা করছে। মজার-মজার কথা হচ্ছে। জোর করে সবাই হাসছে। মাঝে-মাঝে মিইয়ে যাচ্ছে। সব চুপচাপ। হঠাৎ যেই মনে পড়ছে বিষণ্ণ হলে তো চলবে না, সঙ্গে-সঙ্গে কথা। আবার হাসি। ভীষণ এক টানাপোড়েনে পড়েছে মন। তারই মধ্যে চলেছে খাওয়ার অভিনয়। শিবশঙ্কর একবার বললেন, "মাছের কালিয়াটা বড় জবরদস্ত রেঁধেছে আজ বউমা। তোমার কাছে কাঁচালঙ্কার আর্টটা আমাকে শিখতে হবে। তুমি একটা রান্নার বই লেখো, নাম দাও 'সপ্তপদী'। ভূমিকাটা আমাকে লিখতে দিয়ো।"

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'ফ্ল্যাট'। শিবশঙ্করের কথাটা সেই রকম ফ্ল্যাট হয়ে হারিয়ে গেল, কারও মন স্পর্শ করল না। জয় বেড়ালটাকে দেখছে। ছেলেবেলা থেকে সে আর দিদি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। একপাশে চোখ মুদে নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছে। ভেতরে আরাম যখন খুব জমে যাচ্ছে, আর রাখা যাচ্ছে না, তখন হাই তুলে বাইরে একটু ছেড়ে দিচ্ছে, প্রেশার কুকারের স্টিমের মতো। টেবিলে যারা বসেছে, তাদের কথা হল—ভাঙব তবু মচকাব না।

প্রথমে যে ভাঙল, সে সাহারা। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। গিলতে পারছিল না। কান্নার দলা আটকাচ্ছিল গলার কাছে। হঠাৎ চেয়ার ঠেলে দুদ্দাড় করে ছুটে চলে গেল বাইরে। একেবারে বাগানে। সেখানে চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। একটা বেশ বড় আকারের ব্যাঙ বেড়ার ধারে থপাক-থপাক করে লাফিয়ে উঠছে মাঝে-মাঝে। শান্তিতে বসতে দিচ্ছে না সুস্বাদু কিছু পোকা। তা না হলে ধ্যানটা এতক্ষণে বেশ জমে যেত।

সাহারাকে ওইভাবে ছুটে যেতে দেখে জয় অনেকক্ষণ ধরেই ভাঙব-ভাঙব করছিল। সাহারাই পথ দেখাল। জয় শিবশঙ্করের পাশ থেকে কোনও কথা না বলে উঠে চলে গেল। শিবশঙ্কর বললেন, "এইবার একে-একে সব আপসেট হচ্ছে। আমার কিন্তু কিছু হচ্ছে না ; কারণ আমার স্বভাবটা হল প্যাটন ট্যাঙ্কের মতো। উদয়ন, তোমার কিছু হচ্ছে!"

উদয়ন কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। নীরবে উঠে চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে জয়া। বিশাল টেবিলে একা শিবশঙ্কর। ঝলমল করছে আলো। সাদা পোর্সিলিনের নানা আকারের প্লেট। ফিনফিনে কাচের গেলাসে টলটলে জল। রান্নাঘর থেকে খাওয়ার

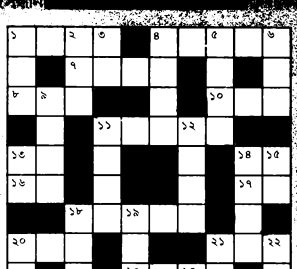

শব্দসন্ধান

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) বড়াননের পিতৃদেব। (৪) জাড়াটের সঙ্গে এঁর কলহ অশান্তিকর। (৭) কঠিন অঙ্ক এইরকম লাগে। (৮) ডাকাতরা এই নিয়ে অন্ধকারে পথ দেখত। (১০) নারী। (১১) এখানে গান্ধীজির আশ্রম। (১৩) —পাখির ঠোঁটটি লাল। (১৪) নির্বোধ। (১৬) নেই মামার চেয়ে এই মামা ভাল। (১৭) যা দিলে কুকুর মাথায় ওঠে। (১৮) এই গাছে বিচিত্র বর্ণের পাতা থাকে। (২০) ছোট-বড়র মাঝামাঝি। (২১) ঘেরা। (২৩) বেশি কথা বলা। (২৫) থাকবার বাসস্থান। (২৬) চাকার মতো পাক খেয়ে ঘোরা।

উপর-নীচ : (১) শীতকালে এর খুব কদর। (২) এই হিরা বেশি চকমকে। (৩) রাজার দোষে রাজ্য—। (৪) যা করতে হয় একবারে না পারলে। (৫) এ-কাজে আইন ভাল জানা চাই। (৬) ভর্ৎসনা, অপমান। (৯) চাঁদোয়া। (১১) শিশুর মনের সৌন্দর্য। (১২) এর আবির্ভাবে বহু লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়। (১৩) যা কপালে এঁকে দেওয়া হয়। (১৪) যার ফলে মাঠ শস্যহীন। (১৫) নুন খাই যার, গুণ—তার। (১৮) স্বর্গের ফুল। (১৯) অতিবৃদ্ধি। (২০) কৃষ্ণের এক নাম। (২১) রেডিয়ো। (২২) হাল্‌কা পাত। (২৪) সামান্য।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	স	ম	ক	ক্ষ		ক	রা	ত	
	মা		ল		স	র	জ	মি	ন
	ধা	ব	মা	ন		ম্		স্র	ব
ক	ন	ক		ক	দা	চা	র		নী
		ব	হা	ল			ক	ষি	ত
হ	ল	কা			বি	রা	ম		
রি		নি	ম	খু	ন		ফে	র	ত
দা	গ		নো		তা	ম	র	স	
স	হ	ম	র	ণ		ষ্ঠ		ক	
	ন	র	ম		খ	র	দৃ	ষ	ণ

ঘরে আসার দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে জয়ের মা আর দিদা। দু'জনেরই হাতে খাবার প্লেট। একটা কিছু পরিবেশন করতে আসছিলেন তাঁরা। এতক্ষণে বেড়ালটা উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে। সে কিছু বুঝতে না পেরে মিউ করে একবার ডাকল। তারপরে টুক করে লাফিয়ে উঠল শিবশঙ্করের কোলে। তিন পাক ঘুরে লেজ গুটিয়ে বেশ জুতসই করে শুয়ে পড়ল। শোওয়ামাত্রই আদরের ঘড়ঘড় শব্দ। সাদা ধবধবে, ভীষণ লোমঅলা একটা কাবুলি বেড়াল।

শিবশঙ্কর নিজের মনেই বললেন, "যাদের মন নেই, পৃথিবীতে তারাই সুখী।"

সারা বাড়িতে একটা থমথমে পরিবেশ। কখনও একটা বাসন রাখার শব্দ। কখনও কল খোলার। কখনও সংক্ষিপ্ত আদেশ। বেড়ালটাকে খেতে দে। কুকুরটাকে বাগানে ঘুরিয়ে আন। শিবশঙ্কর ডেকচেয়ারে আধশোয়া হয়ে ভাবছেন, কাল থেকে নতুন আর একরকমের জীবন শুরু হবে। অকারণে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। এক-একটা পরিস্থিতিতে যে-কোনও কথাই খুব অবান্তর মনে হয়। সরলা স্টেশন ছুঁয়ে রাতের শেষ ট্রেন চলে যাচ্ছে। সেই হুহু করা শব্দটা শিবশঙ্কর শুনছেন। বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে মনের আঁটসাঁট ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। আজেবাজে চিন্তা আসে। যেখানে বসে আছেন সেইখান থেকে সরলা ডাকঘরের বাড়ির একটা অংশ দেখা যায়। বাইরের দেওয়ালে একটিমাত্র আলো জ্বলছে। সারা রাত জ্বলে থাকবে একা আলো। জ্বলে থাকাটাই তার কর্তব্য, যেমন শিবশঙ্করের বেঁচে থাকাটাই অবশিষ্ট কয়েক বছরের কর্তব্য।

ভেতরের ঘরে কেউ একজন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বোঝার চেষ্টা করলেন, কে? মনে হচ্ছে, জয়ার মা। মেয়েটা বড় ভাল। এক নম্বর মেয়ে। বড় স্নেহের পাত্রী। এত বছর সংসারে আছে। রাগতে তো জানেই না, সবসময় মুখে একটা হাসি। এই প্রথম শিবশঙ্কর তাকে কাঁদতে দেখছেন।

জয়, জয়া আর সাহারা রাতের অন্ধকারে অদ্ভুত একটা কাজে ব্যস্ত। পরিকল্পনাটা জয়ের। একটা কাগজে তারা লিখেছে :

প্রিয় শিউলি,

তোমাকে এনেছিল জয়া খড়ক সিংয়ের বাগান থেকে। সঙ্গে ছিল শিরিন। তুমি বড় হলে আমাদের চোখের সামনে। তুমি আমাদের আর-এক বোন। তুমি প্রতি শরতে সুন্দর ফুল ফোটাবে। এখন যেমন ফোটাচ্ছ। রোজ সকালে, একটা, দুটো, অনেক অনেক, ফুল তুমি বিছিয়ে রাখবে তলায়, ঘাসের ওপর। আমরা থাকছি না। কালই চলে যাচ্ছি অনেক দূরে। তোমার কাছে আমাদের আর এক বোন সাহারা থাকছে। তুমি আমাদের দাদি আর দিদাকে দেখো। আমাদের আরও এক বোন শিরিন না বলে কোথায় চলে গেছে, যদি ফিরে আসে তার হাত ভরে দিয়ো ফুলে। চার্চের ফাদার আর সিস্টারদের দেখো। আর আঙ্কল ম্যানফ্রেড যদি ফিরে আসেন, তাঁকে বোলো, মোটর সাইকেল তো আছেই, আমাদের ওখানে একবার যেতে। ম্যানফ্রেড মারা গেছেন এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

তুমি ভাল থেকো। অনেক, অনেক বছর বেঁচো। তুমি হলে শিশিরের ফুল। আমরা যদি না আসি, তুমি আমাদের অপেক্ষায় থেকো। তোমাকে আমরা ভুলব না কোনও দিন।

ইতি তোমার

জয় ও জয়া।

এইবার কী হবে! জয়া একটা শিশির মধ্যে চিঠিটাকে গোল করে পাকিয়ে ঢুকিয়েছে। মুখটাকে ভাল করে বন্ধ করেছে ছিপি আর গালা দিয়ে। দুপুরবেলা তিনজনে মিলে বেশ গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল শিউলিতলায়। গর্ত থেকে যা মাটি উঠেছিল সারাদিনের

রোদে শুকিয়ে বেশ ঝুরঝুরে হয়েছে। জয়া খুব সাবধানে বোতলটাকে সেই গর্তে শোওয়াল। বোতলের গলায় নিজের হাত থেকে খুলে একজোড়া চুড়ি পরিয়েছে। সাবধানে ঝুরো-ঝুরো মাটি ফেলছে তিনজনে। ঝুপঝাপ শব্দ। গর্তটা ভরে গেল। হাত দিয়ে চেপে-চেপে মাটি বসিয়ে জায়গাটা সমান করে তার ওপর ঘাস বিছিয়ে দিল।

জয়া সাহারাকে বলল, "কাউকে বলবি না এখানে কী আছে। তুই তো থাকবি, জায়গাটা পাহারা দিবি। বর্ষায় যদি দেবে যায়, আর একটু মাটি দিয়ে দিবি। লক্ষ্মী বোন আমার !"

রাতের অন্ধকার, তবু তারা টর্চ জ্বেলে বাগানটা একবার চক্কর মেরে এল। গন্ধরাজ গাছগুলো ফুলে-ফুলে সাদা হয়ে গেছে। গন্ধে চারপাশ আমোদিত। কাল রাতে তারা তো আর এখানে থাকবে না। তখন অনেক-অনেক দূরে। রাতের বাগানের রহস্যটা তাই শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে।

তারা রকে উঠতে-উঠতে শুনল, দাদি বলছেন, "তোমরা এইবার শুয়ে পড়ো, কাল ভোর-ভোর উঠতে হবে। সকালেই ট্রেন। মনে আছে তো !"

উদয়নের ঘরের মেঝেতে সার-সার ব্যাগ আর সুটকেস। সব গোছগাছ করে সাজানো। প্রত্যেকটায় ক্যালেন্ডার থেকে সংখ্যা কেটে লাগানো হয়েছে, এক, দুই, তিন। নাম, ঠিকানা লেখা হয়েছে। উদয়ন নিজের খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছেন, পায়ের ওপর পা, কপালের ওপর ভাঁজ-করা দুটো হাত। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে আছেন। নিজের সঙ্গে যখন বোঝাপড়া চলে তখন এইটাই তাঁর চিরপরিচিত ভঙ্গি। এই সময় কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। উদয়ন মিতবাক স্বভাবের মানুষ। সবসময় নিজের ভাবেই মগ্ন থাকেন।

জয়, জয়া আর সাহারা দিদার খাটে। দিদাকে ঘিরে বসেছে। বেড়ালটাও আছে। নিশ্চিন্ত মনে গা চাটছে নানাভাবে, নানা কায়দায়। যেন একটু পরেই কোনও দূর দেশে বেড়াতে যাবে। জয়া তার নরম তুলতুলে গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তুই কোথাও বেড়াতে যাবি নাকি রে পুসি !"

পুসি তার ব্যস্ততা থামিয়ে জয়ার দিকে মুখ তুলে আধবোজা চোখে বলল, "মিউউ।" জয় দিদার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। উলটো হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "একটা গল্প বলো না দিদা, সেই ছেলেবেলার গল্প, এক যে ছিল রাজা, আর এক যে ছিল রানি।"

দিদা বলছেন, "সে রাজ্য নেই, রাজা নেই, রানিও আর নেই। রাজপুত্র আর রাজকন্যা গেছে দূর বিদেশে লেখাপড়া করতে। তারা বলেছে, জ্ঞানের রাজ্য জয় করে, সেই রাজতন্ত্রের রাজসিংহাসনে বসবে। তারাও যুদ্ধ করবে। জ্ঞানের তরোয়াল দিয়ে অন্ধকার, অজ্ঞান, কুসংস্কার, অভাব, অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই করবে। তাদের মহারাজাধিরাজ, মহাজ্ঞানেশ্বর, স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সেই রাজকুমারকে দুটো তরোয়াল ঘোরাতে শিখিয়েছেন, ত্যাগ আর বৈরাগ্য। দুটা ধবধবে সাদা ঘোড়া কিনে দিয়েছেন, একটার নাম কর্ম, আর একটার নাম ধর্ম। একটা ঝকঝকে রথ দিয়েছেন, সেই রথের নাম সংযম। সেই রথের সারথি এক উজ্জ্বল পুরুষ, তাঁর নাম বিবেক। আর মহাশিক্ষক হলেন, সময়। এই হল চিরকালের গল্প। এইবার আমার এক প্রিয় কবিতার শেষটা শোনো :

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম— অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

চোখ বুজে আবৃত্তি করছিলেন। চোখ খুলে দেখলেন, সামনে পরিপূর্ণ সংসার। সুরেলা, দৃপ্তকণ্ঠের আবৃত্তি শুনে সবাই ঘরে চলে এসেছেন। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, কাজের মেয়েরা, বাগানের মালী। শিবশঙ্কর বললেন, "অনেকদিন পরে তুমি বেরিয়ে এলে। তা হলে একটা গানও হয়ে যাক।"

বৃদ্ধা এককথায় ধরলেন, রবীন্দ্রনাথের গান, "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে/আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।"

এক সময় গান শেষ হল। একে-একে সব আলো নিভে গেল। শুধুমাত্র একটি দেওয়ালঘড়িতে সময়ের টিকটিক চলার শব্দ।

সকাল ছ'টার সময় বাড়ি একেবারে খালি। সবাই সরলা স্টেশনে। ট্রেন আসবে ছ'টা কুড়িতে। ছেড়ে যাবে ছটা তিরিশে। মাস্টারমশাই বেরিয়ে এসেছেন প্ল্যাটফর্মে, "ডাক্তারবাবু আমাদের ছেড়ে সত্যিই তা হলে চললেন !"

উদয়ন বললেন, "আমার একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু কী করব, আমার চাকরি।"

"আমাদের শহরটা এইবার সত্যিই খালি হয়ে গেল। আমার চাকরি আর মাত্র এক বছর আছে। তারপর আমিও চলে যাব মুঙ্গেরে। আপনি যাচ্ছেন প্রবাসে, আর আমি যাব আবাসে, তাও আমার দুঃখ লাগছে। এই জায়গাটার একটা মায়া আছে।"

চার্চের ফাদার বললেন, "সামনের মাসে আমরাও ফিরে যাচ্ছি স্কটল্যান্ডে।"

মাস্টারমশাই বললেন, "শ্মশান হয়ে গেল ! শিবশঙ্করবাবু, আপনি কী করবেন ?"

"নতুন যাঁরা আসবেন আমি তাঁদের নিয়েই নতুনভাবে বাঁচতে শিখব। মানুষ চলে গেলেও জায়গাটা তো পালাচ্ছে না। আমার কোনও দুঃখ নেই। আই নো হাউ টু লিভ !"

ট্রেন আসছে। সেই নিষ্ঠুর যন্ত্র, যে মানুষের কাছ থেকে মানুষকে নিয়ে চলে যায়। শিবশঙ্কর জয় আর জয়াকে দেখছেন। কী সুন্দর বেড়ে উঠছে ছেলেমেয়ে দুটো। অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। অসম্ভব হবে এদের ছেড়ে বেঁচে থাকা। সে-কথাটা তো বলা যায় না। বড়জোর একটা গান গাওয়া যায় মনে-মনে :

তোমার হল শুরু আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা ॥
তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথী
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা ॥

শিবশঙ্কর আবেগ অপছন্দ করেন, তাই মনে-মনে বললেন, যেখানেই থাকো তোমরা বড় হও, মানুষ হও। তোমাদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। শিবশঙ্কর লক্ষ করছেন, সকলের চোখই ভরা নদী।

ট্রেন থামতে-থামতে একেবারেই থেমে গেল। এঞ্জিনের একটা আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। বেপরোয়া কঠিন। প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একজন মাত্র যাত্রী নামলেন। চোখে পড়ার মতো চেহারা। ছ' ফুট লম্বা ছিপছিপে ধারালো চেহারা। পরনে শেরোয়ানি। দেখলেই মনে হয় যোধপুর থেকে আসছেন, ধনী মানুষ।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, "আমি খড়ক সিংজির ভাই। আপনারা!"

শিবশঙ্কর বললেন, "আমি, আমরা সবাই সিংজির বন্ধু। অনেক আগেই আপনাকে আশা করেছিলুম।"

"দুঃখিত, আমি ইংল্যান্ডে ছিলুম। আসামাত্রই আমার ম্যানেজার

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

পান্ডব গোয়েন্দা

কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখালেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এসেছি।"

"এই আমার ছেলে ডাক্তার উদয়ন। এই ট্রেনেই ওরা যাবে। একটু অপেক্ষা করুন, ওদের আগে তুলে দিই।"

"ও ইয়েস।"

ভদ্রলোক নিজেই মালপত্র তোলার জন্য ব্যস্ত হলেন। একেবারে নিরহঙ্কারী মানুষ, "ডক্টর ইওর ডেসটিনেশান?"

"লখনউ।"

"লখনউ! দ্যাট ইজ মাই ডেসটিনেশান। দ্যাট ইজ মাই সেকেন্ড হোম। এখান থেকে আমি ওখানেই যাব। তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। ইউ উইল বি ইন দ্য জেনারেল হসপিট্যাল। আপনাকে আমি আমার গার্ডেন হাউসে রাখব। দ্যাটস দ্য বেস্ট লোকেশান ইন দ্য সিটি। আমাদের ক্লাবে আপনাকে মেম্বার করে নেব। ইউ উইল লাভ দ্য প্লেস।"

শিবশঙ্কর বললেন, "দেখলে, কী অভাবনীয় যোগাযোগ! সব যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল।"

হুইসল বাজল। ঠ্যাং-ঠ্যাং ঘন্টা। ট্রেন এইবার ছাড়বে। কামরায় সবাই বেশ গোছগাছ করে বসেছে। প্রণামের পালা সাঙ্গ। কেউই কথা বলতে পারছে না। বলতে গেলেই কান্না বেরিয়ে আসবে।

ট্রেন গতি নিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে যাচ্ছে একসার মুখ। পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি। দূরে, আরও দূরে। বাঁশির শব্দ। লোহার একটা সরীসৃপ সংসারের আখখানা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। শেষ, গার্ডের কামরাটা যেন ভাসতে-ভাসতে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। পড়ে রইল প্ল্যাটফর্ম। একজোড়া নিষ্ঠুর রেল লাইন। আর কয়েকজন মানুষ। শিবশঙ্কর ফিরে তাকালেন নবাগতের দিকে, "চলুন। লেটস গো।"

যেমন সময় বলে মানুষকে, চলো হে। চলতে তোমাকে হবেই। হয় এদিকে, না হয় ওদিকে। তুমি যদি নাও চলো, আমি তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব আমার স্রোতে। আজ থেকে কালে, কাল থেকে আরও দূর কালে। অদৃশ্য এক মহাতরঙ্গ। বহুকাল পরে, কে কোথায় থাকবে! কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে। এই নিবাস পরিত্যক্ত হবে। একটি সুখের সংসারের স্মৃতি। ভেঙে পড়া পাঁচিল। গেট নেই। পিলার দুটো আছে। আগাছায় ঢেকে গেছে বাগান। জীর্ণ বাড়ির রোদে-পোড়া দরজায় বিশাল এক মরচে-ধরা তালা। উদয়ন কোথায়! হয়তো কলকাতায়। অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। জয় কোথায়? আমেরিকায়। জয়া? জয়া তো ইংল্যান্ডে। আর সাহারা! সে তো সরলাতেই সংসার করেছে। শিবশঙ্কর তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন।

শরতের ভোরে পরিত্যক্ত নির্জন বাগানে শিউলি তখনও আকাশের শিশির ধরে ফুল করে ঝরিয়ে চলেছে। তার তো চলা নেই। সময়েরও হিসেব সে রাখে না। সে শুধু জানে, সময়কে কেমন করে ফুলে ফোটাতে হয়, আর নিঃসীম আনন্দে নিঃশেষে ঝরাতে হয়।

(সমাপ্ত)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন সে ছবির কল্পনা

এবারে দ্যাখো, আর একটা নতুন ছবির আভাস। এখন তো আর একই ছবি বারবার আঁকা নয়! তোমাদের হাত এখন অনেকটাই পরিণত হয়ে উঠেছে রেখার টানে। তাই এবারে একেবারেই অন্য রকম ছবির আভাস দিলাম। তোমরা ভেবে দ্যাখো তো, এই আভাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার কোন সে ছবির কল্পনা!

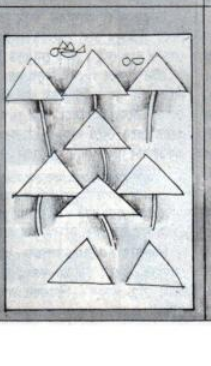

হাসিখুশি

দিদিবাবু : আমি যে মাছ কিনে এনেছি চার টাকা আশি পয়সা দিয়ে তুমি ঠিক সেই মাছই কিনে এনেছ পাঁচ টাকা কুড়ি পয়সা দিয়ে। বলো তো কত ঠকেছ?

খোকন : টাকার হিসেবে একটু ঠকলেও পয়সার হিসেবে জিতে গেছি ষাট পয়সা।

প্রথম অপরাধী : আপনি কেন জেলে এসেছেন?

দ্বিতীয় অপরাধী : ছোট এক টুকরো দড়ি চুরির অপরাধে।

প্রথম অপরাধী : এ তো হচ্ছেই

পারে না!

দ্বিতীয় অপরাধী : কেন পারে না? দড়ির সঙ্গে একটা মোষ বাঁধা ছিল।

সঙ্গীতশিক্ষক : তুমি কোন তাল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো?

ছাত্র : সার, আমি হরতাল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি।

নানারকম

ধাঁধা

পয়লা বৈশাখটা বরাবরই ভাল কাটে ছোট্কার। সকালে নববর্ষের বিশাল আড্ডা। একবার এ-বন্ধুর বাড়িতে, একবার ও-বন্ধুর। সেই বিশেষ আড্ডায় খোশগল্প থাকে, গান থাকে, কবিতাপাঠ হয়। আর থাকে বাঙালি জলখাবার। দুপুরে বাড়িতেও একটু-আধটু বিশেষ আয়োজন হয়। সেই মধ্যাহ্নভোজে বসে প্রত্যেক বছর সকালের অভিজ্ঞতার কথা রসিয়ে-রসিয়ে বলে ছোট্কা।
দুপুরে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। ফের বেরনো থাকে ছোট্কার। এবার বইপাড়া। এ-প্রকাশন থেকে ও-প্রকাশন। ডাবের জল আর সন্দেশ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় আর লাড্ডু। ঠাণ্ডা পানীয় অবশ্য ছোট্কার ভীষণ পছন্দ। ছোট্কার মুখে শুনলাম, অন্যবার যারা গরম চা খাওয়ান, তাঁরা এ-বছর সব্বাই বেছেছেন ঠাণ্ডা পানীয়। একেই বলে হুজুগ!
নববর্ষের বিকেলে বইপাড়ায় গেলে, ছোট্কার কাঁধের ঝোলা ক্রমশ ভারী হতে থাকে। কোনও-কোনও দোকানে ছোট্কা বই কেনে। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে লেখকবন্ধুরা তাঁদের সদ্য- বেরনো বই সই করে উপহার দেন ছোট্কাকে। ঝুলি-ভর্তি বই নিয়ে ফেরে ছোট্কা।
এইবারও নববর্ষের প্রথম দিনটায় খানপনেরো বই নিয়ে ফিরেছে ছোট্কা। তার মধ্যে একজন বিশেষ লেখকেরই পাঁচ-পাঁচখানা বই। লেখকটি নাকি ছোট্কাদের সঙ্গেই কলেজে পড়তেন। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে বছর দশেক হল দিল্লিতে ফিরেছেন। তিনি তাঁর সেই বাইরের অভিজ্ঞতাকেই একের-পর-এক বইতে এখন লিখে চলেছেন। স্বনামে নয়, ছদ্মনামে। ছদ্মনাম বলেই ছোট্কা এতকাল খেয়াল করেনি যে, পুরনো এক বন্ধু এখন মোটামুটি খ্যাতিমান লেখক।

তো, ছোট্কা এবার বইপাড়ায় গিয়ে পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে। সেইসঙ্গে আমিও লাভবান। কেননা, ছোট্কার নতুন ধাঁধাটা সেই লেখকবন্ধুটিকেই কেন্দ্র করে। শুনবে ধাঁধাটা? শোনো।
প্রথম ধাঁধা ॥ ঠিক দু' বছর অন্তর এক লেখকের বই বেরোচ্ছে। তাঁর পঞ্চম বইটি যে-বছর বেরিয়েছে, সে-বছর তিনি একটা জায়গায় পর-পর লিখে গেলেন প্রতিটি বইয়ের ইংরেজি প্রকাশ-সাল। সবক'টি বছর পর-পর লিখে যোগ করলেন। দেখলেন, যোগফল হয়েছে : ৯৯৫০। এ থেকে বলতে পারো, তাঁর প্রথম বইটি ইংরেজির কোন সালে বেরিয়েছিল? খুব সহজ ধাঁধা কিন্তু।
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন বেশ সন্ন্যাসীকেও মিষ্টি করে তোলে?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— বুনাদস্তানা

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৮১টা লিচু কিনেছিলেন। পথে ২৭টি নিজেই খেয়েছেন গৃহকর্তা। গিন্নিমা হাতে পেয়েছিলেন ৫৪টি লিচু (৮১—২৭)। তিনি খেয়েছিলেন ১৮টি। টেবিলে রেখেছিলেন (৫৪—১৮) অর্থাৎ ৩৬টি লিচু। ছেলে খেয়েছে ১২টি। রাতে তিনজনের জন্য পড়ে ছিল ২৪টি লিচু (৩৬—১২), প্রত্যেকের ভাগে ৮টি করে। (২) বাউল। (৩) অনুশাসন।

সত্যসন্ধ

ভাবতে-ভাবতে

কল্পবিজ্ঞান আজ আমাদের পৌঁছে দিয়েছে এক অসাধারণ জগতে। আমরা অনেকেই এখন কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য বা কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্রের ভক্ত। কল্পবিজ্ঞানের লেখা পড়তে-পড়তে আমরা মুহূর্তেই পৌঁছে যাই সেই দেশে— যেখানে আজকের কল্পনা একদিন সত্যি করে তুলবে বিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র দেখতে বসে আমরা চোখের সামনে পেয়ে যাই ভিনগ্রহের প্রাণীকে।

এবারের ভাবতে- ভাবতে হল এইসব কল্পবিজ্ঞান নিয়ে।
১ ॥ 'জুরাসিক পার্ক' স্পিলবার্গের বিখ্যাত ছবি। জুরাসিক পার্ক কাহিনীর লেখক কে?
২ ॥ একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী হলেন কল্পবিজ্ঞান লেখক। এই তিনজনের মধ্যে তিনি কোনজন—সি.এন.আর.রা, জে.ভি. নার্লিকর, ই.সি.জি. সুদর্শন।
৩ ॥ বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী '২০০১ : আ স্পেস ওডিসি' কার লেখা?
৪ ॥ 'দ্য ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ড্‌স' কল্পবিজ্ঞান কাহিনীটি কার লেখা?

উত্তর : (১) মাইকেল ক্রাইটন। (২) জে. ভি. নার্লিকর। (৩) আর্থার সি. ক্লার্ক। (৪) এইচ. জি. ওয়েলস।

বর্ণপ্রিয়

মজার খেলা

একটা পুরনো ক্যালেণ্ডারের ১ থেকে ৮ পর্যন্ত সংখ্যা কেটে নাও। তারপর আটটা চৌকো টুকরো পিজবোর্ডের ওপর সংখ্যা আটটাকে সেঁটে ফ্যালো। মনে রেখো, বাংলা ক্যালেন্ডার কাটলে হবে না। ইংরেজি ক্যালেন্ডার থেকে কাটতে হবে সংখ্যাগুলো।
কেটেছ? ব্যস, তা হলে তুমি তৈরি মজার খেলার জন্য।
কী হল? খেলাটাই বলা হয়নি বুঝি? তাই তো! খুব ভুল হয়ে গেছে। তুমি করবে কী, টেবিলের ওপরে, ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে, দু' সারিতে আটটা টুকরোকে সাজিয়ে রাখবে শুধু, রাখার সময় ৬ টাকে উলটে ৯ করে সাজাবে।
রেখেছ? এবার বন্ধুদের বলো, দুটো সারির যোগফল মিলছে না। এক দিকে হচ্ছে ১৮, অন্যদিকে ২১। তারা যেন চৌকোগুলোকে ইচ্ছেমতো

1	3
2	4
7	9 ←(উলটে বসছে)
8	5

সাজিয়ে এমনভাবে বসায় যাতে কিনা বাঁ দিক ও ডান দিকের সংখ্যাগুলোর যোগফল সমান হয়। দেখবে, বন্ধুরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। খাবে না কেন, তারা তো আর জানে না তুমি কীভাবে প্রথমেই নয়-ছয় করে রেখেছ। হ্যাঁ, ওই উলটো নম্বরটাকে সোজা করে বসালেই দু'পাশের যোগফল সমান-সমান। একদিকে ১ + ২ + ৭ + ৮ = ১৮। অন্যদিকে ৩ + ৪ + ৬ + ৫ = ১৮। তুমি নিজেই এবার করে দেখাও। দেখবে বন্ধুরা জব্দ। মুখে নাই শব্দ। শব্দ নাই বলা বোধ হয় ঠিক হল না। শব্দ থাকবে। সেটা তোমার দুষ্টুমি বুদ্ধির তারিফ-করা শব্দ।

মজারু

ছবি : দেবাশিস দেব

ফিডলার অন দ্য রুফ কাহিনীর নেপথ্যে

কসাকদের ইহুদি-নিধন যজ্ঞের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল 'ফিডলার অন দ্য রুফ'।

ব্রডওয়ে-র 'মিউজিক্যাল' এসেছে শহরে, হাজার হাজার মানুষকে মাতিয়ে তোলার পক্ষে এই ছোট্ট চার শব্দের বাক্যটির কোনও জুড়ি ছিল না। জরুরি নানা কাজ ফেলে সব বয়সের মানুষ ছুটবে টিকিটের জন্য লাইন দিতে, এমনই ছিল ব্রডওয়ে দলটির জনপ্রিয়তা। এই জনপ্রিয়তা এক সময় এতটাই ছিল যে, তাদের একটির পর একটি 'প্রোডাকশন' বাজারে হিট, একেবারে যাকে বলে 'ব্লকবাস্টার'। কিন্তু ব্রডওয়ে দলের অতীতের সব নজির ম্লান করে দিয়েছিল তাদেরই একটি মিউজিক্যাল, 'ফিডলার অন দ্য রুফ'। নাচ আর গানে জমজমাট মিউজিক্যাল নাটক বা চলচ্চিত্রকে হিট করাতে গেলে যেসব বিনোদনের উপকরণ সচরাচর রাখা হয়, ফিডলার অন দ্য রুফ ছিল সব দিক থেকেই তার এক প্রবল ব্যতিক্রম ; অসহনীয় দারিদ্র্য ও নির্যাতন এবং প্রতিকূল সমাজবাস্তবতার মধ্যেও একজন মানুষের নিজের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকার মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে যে একটি মিউজিক্যাল আদৌ তৈরি করা যেতে পারে, তা এর আগে ভাবতেই পারত না কেউ। সময়টা ১৯৬৪ সাল।

ফিডলার অন দ্য রুফ যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন তার সাফল্যকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু সব সমালোচনা ও বিতর্ককে নস্যাৎ করে একটানা সাত বছর ন' মাস ধরে চলল মিউজিক্যালটি, ব্রডওয়ের টুপিতে জুড়ে দিল সবচেয়ে বর্ণময় পালকটি। পরে অবশ্য এই নজির টপকে গিয়েছে 'গ্রিজ', ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থনৈতিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার নতুন নজির স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু, ফিডলার অন দ্য রুফের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনের মূল কারণটি কী ? নাটকের পটভূমি ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার এক

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে পেজ মারি

ইহুদি-অধ্যুষিত গ্রাম আনাতেভকা। কাহিনীটি ১৯০৫ সালের। কাহিনীর টানাপোড়েন গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় চরিত্র তেভিয়েকে ঘিরে। তেভিয়ে ছিল পেশায় পশুপালক, তার স্ত্রী গোলডা ও তাদের পাঁচ মেয়েকে নিয়ে ছিল তার সংসার। স্বচ্ছল ছিল না তার জীবন, কিন্তু সকলের মতো তারও ছিল নিজের মতো করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, ছিল সুন্দর জীবনের স্বপ্ন। বড় মেয়ে তজেইতেল বাবার অমতে বিয়ে করে এক গরিব দর্জিকে, যদিও তেভিয়ে তার জন্য পছন্দসই পাত্র খুঁজে রেখেছিল। তজেইতেলের বিয়ের ঘটনাই প্রথম আঘাত নিয়ে আসে পরিবারের ওপর। কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না ঘটনা। মেজো মেয়ে হোডেল বিয়ে করে, বলাই বাহুল্য বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এক বিপ্লবীকে। বিপ্লবীর সঙ্গে তাকেও শেষ পর্যন্ত যেতে হয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। সেজো মেয়ে শাভা বিয়ে করে ধর্মের বাইরে গিয়ে একজন অ-ইহুদিকে। এভাবে একটির পর একটি আঘাতে ভাঙতে থাকে পরিবারের বাঁধন, তেভিয়ের সযত্নলালিত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এর পরই নিয়তির শেষ আঘাতের মতো নেমে আসে জারের নিয়ন্ত্রণাধীন কসাক-বাহিনীর আক্রমণ, গোটা আনাতেভকা গ্রাম তছনছ করে শত-শত ইহুদি অধিবাসীর খেত-খামার জ্বালিয়ে দিয়ে শাসকের রক্তপিপাসার নিবৃত্তি হয়। এর পরের ঘটনা বড় মর্মান্তিক, তেভিয়েকে আমরা দেখি একজন বিধ্বস্ত মানুষ, জীবন যার কাছে মূল্য হারিয়েছে অনেক। একদিকে নিজের পারিবারিক অশান্তি, অন্যদিকে বিপুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তেভিয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে সে দেখে তার চারপাশের ধ্বংসের মারণযজ্ঞ। কিন্তু না, এই অপরিসীম হতাশার মধ্যেও শেষ হয় না কাহিনীর। অবশিষ্ট যা ছিল তাই নিয়ে আনাতেভকা ছেড়ে আমেরিকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তেভিয়ে, নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন শেষ মুহূর্তেও তাকে ছাড়ে না। এই আশাবাদের কথাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নাটকটির কেন্দ্রীয় সুর। আর তার পাশাপাশি, কে ভুলতে পারবে সেইসব অবিস্মরণীয় গান যা গোটা ছয়ের দশকে মুখে-মুখে ফিরত আমেরিকায় 'ইফ আই ওয়্যার আ রিচ ম্যান,' 'ম্যাচমেকার ম্যাচমেকার', 'সানরাইজ, সানসেট', 'আনাতেভকা' ইত্যাদি গানের কথা ও সুরের মধ্যে - পরতে-পরতে মিশে ছিল গভীর জীবনবোধ ও ভালবাসা, বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ও স্পর্ধা।

ফিডলার অন দ্য রুফ -এর পরিকল্পনা প্রথম মাথায় এসেছিল জেরি বক, শেলডন হারনিক ও জোসেফ স্টাইনের। শোলোম আলেই খেম-এর ছোট গল্প 'তেভিয়ে অ্যাণ্ড হিজ ডটারস্' কে নাট্যরূপ দিয়ে তাঁরা প্রযোজক হ্যারল্ড প্রিন্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত হ্যারল্ড প্রিন্সের মধ্যস্থতায় জেরোম রবিন্স নাটকটি পরিচালনা করতে রাজি হন। এই-ই হল ফিডলার অন দ্য রুফ -এর নেপথ্যের ইতিহাস। ১৯৭১ সালে এটির চলচ্চিত্রায়ণ হয়। মঞ্চের বিপুল সাফল্যই প্রযোজককে উৎসাহী করেছিল এটির চলচ্চিত্ররূপ দিতে। ছবির জন্য নতুন করে লেখা হয় চিত্রনাট্য, শুটিং হয় যুগোস্লাভিয়ার জাগ্রেব-এর কাছে একটি গ্রামে। ১৯০৫ সালের রাশিয়াকে বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য চেহারায় দর্শকের কাছে হাজির করার জন্য খামার ও পশুশালার সেট তৈরি হয়েছিল অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ছবিটিতে কয়েকটি কাহিনীর মেজাজ নিয়ে আসার জন্য রঙের ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, এই দায়িত্বটি নিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর মার্ক শাগাল। ছবিটি কলকাতায় বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) সুনীল গাওস্কর টেস্ট ক্রিকেটে মাত্র একটিই ডাকেট পেয়েছিলেন। সেটি কার ? **আলি আফজল**, বীরভূম।
(২) 'আফ্রিকান সিং' বলে ডাকা হয় কোন দেশকে ? **বাপন দত্ত**, নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।
(৩) ভিত্তোরিয়ো দে সিকা-র 'টু উইমেন' ছবিটি তৈরি হয়েছে কোন সাহিত্যিকের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ? **বসুন্ধরা ঘোষাল**, নাকতলা, কলকাতা।
(৪) আকিরা কুরোসাওয়া-র 'রশোমন' ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কে ? **তন্ময়ী নন্দী**, গড়ফা, কলকাতা।
(৫) পৃথিবীর বৃহত্তম টেলি-যোগাযোগ উপগ্রহ কোনটি ? **ঊর্মিতা মাইতি**, কলেজ রোড, ঝাড়গ্রাম।
(৬) ভারতের কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ তাদের উপগ্রহ সমেত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ? **দিগ্বিজয় বণিক**, যাদবপুর, কলকাতা।
(৭) কোন সাল থেকে টেনিস বলের রং হলুদ করা হয় ? **মৈত্রেয়ী প্রধান**, স্থলবাজার, কাঁথি।
(৮) টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে 'ডবল' করার রেকর্ড কে করেছেন ? **বাপিন ভট্টাচার্য**, মডার্ন পার্ক, কলকাতা।
(৯) কোন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক 'এলিয়া' ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখেছেন ? **রূপান্তর রায়**, পার্ক সার্কাস, কলকাতা।
(১০) 'দ্য আগলি ডাকলিং' কোন সাহিত্যিকের রচনা ? **অগ্নিমিত্র বসু**, গুয়াহাটি, অসম।
(১১) ১৯৯৪ সালের সুপার সকার সিরিজ খেলতে নরওয়ের যে দলটি এসেছিল, তার পুরো নাম কী ? **পার্থ বসুচৌধুরী**, সন্তোষপুর, কলকাতা।
(১২) চার্লস ডিকেন্সের অসমাপ্ত উপন্যাসটির নাম কী ? **রাজশ্রী দাস**, রামচন্দ্রপুর, হাওড়া।
(১৩) ভ্রূ-কুঞ্চনের জন্য কত পেশির সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয় ? **সৌকর্য ঘোষাল**, নাকতলা, কলকাতা।
(১৪) ফিফা নির্বাচিত ১৯৯৩ সালের বর্ষসেরা ফুটবলার কে ? **শুভব্রত সরকার**, ভেনাস স্কোয়ার, কোচবিহার।
(১৫) প্রাচীন গ্রিস থেকে ভারত যে চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছিল, তার নাম কী ? **আশিস ঘোষ**, ঝোড়হাট, হাওড়া।
(১৬) ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি ? **সুব্রত সিংহ**, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
(১৭) মানবদেহের রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন কে ? **নির্মলেন্দু চক্রবর্তী**, আশ্রম রোড, কোচবিহার।
(১৮) মহিলা ক্রিকেটের 'ডন ব্র্যাডম্যান'বলা হয় কাকে-? **সুদীপ্ত ভট্টাচার্য**, করিমপুর, নদীয়া।
(১৯) সাঁওতালি ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'মোহমুক্তির' পরিচালক কে ? **রামকৃষ্ণ আঢ্য**, ভবানীপুর, কলকাতা।
(২০) কোন ক্রিকেটারের ডাকনাম জো ? **অশোক রায়**, যোগপুর পার্ক, কলকাতা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) আশা ভোঁসলে।
(২) তসলিমা নাসরিন।
(৩) সেন কিংসলে।
(৪) লা স্কালা (দ্য রোড)।
(৫) বেনজির ভুট্টো।
(৬) রাজ কাপুর।
(৭) অফস্ট্যাম্প লাইন।
(৮) শান্তিদেব ঘোষ।
(৯) এলিজাবেথ টেলর।
(১০) হাশ্বার, ডবলিউ. বি.এ. ৮৬৮৯।
(১১) শেরু।
(১২) ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই, নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্দো-তে।
(১৩) বলবীর সিং।
(১৪) ভিক্টর ট্রাম্পার।
(১৫) ইছামতী উপন্যাস, ১৯৫১ সালে।
(১৬) প্রথম ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর', শেষ ছবি 'প্রিয় বান্ধবী'।
(১৭) পাবলো পিকাসো।

শান্তিদেব ঘোষ

তসলিমা নাসরিন

ফেদেরিকো ফেলিনি

রাজ কাপুর

প্রশ্ন

(১) কপিলদেবকে 'হরিয়ানা হ্যারিকেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে কোন বইয়ে ?

(২) জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ ?

(৩) 'মাই বয়হুড ডেজ' নামে মারজোরি সাইকস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে অনুবাদগ্রন্থটি লিখেছেন, সেটি অনূদিত হয়েছে কোন গ্রন্থ থেকে ?

(৪) "বনধ বাদ দিয়ে কলকাতা, আর ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটক একই কথা।" উক্তিটি কোন চিত্র-পরিচালকের ?

(৫) সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবিটি কার উপন্যাসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ?

(৬) কিপলিঙের 'জাঙ্গল বুক' বইয়ে মুগলি ছাড়া আরও দু'জনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে নেকড়ে-পরিষদের সভায় যোগদান করার। সেই দু'জন কারা ?

(৭) বাংলা গানে গজল-আঙ্গিকের প্রচলন করেন কে ?

(৮) 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' কার লেখা ?

(৯) 'আবোল-তাবোল'-এর লেখক সুকুমার রায়ের পুত্র লেখক, শিল্পী ও চিত্র-পরিচালক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কে তিনি ?

(১০) 'অর্থশাস্ত্র' কে লিখেছিলেন ?

(১১) 'পঞ্চতন্ত্র' কার লেখা ?

(১২) ১৯২৯ সালের একটি বিখ্যাত টেলিফোন নম্বর 'বড়বাজার ১৯৪৫'। কার নম্বর, বলতে পারো ?

(১৩) 'দ্য ওয়ে টু কমিউনাল হারমনি' বইটি লিখেছেন কে ?

(১৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের লেখক কে ?

(১৫) 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' এক কাল্পনিক চরিত্র, যে একটানা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল বহু বছর। কত বছর, বলতে পারো ?

(১৬) শিমের বোঁটা বেয়ে উঠেছিল গল্পের কোন চরিত্র ?

(১৭) অব্যবহার্য লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী এই লোকটি থাকে তার কাকা টাইটাসের সঙ্গে। লোকটির নাম কী ?

(১৮) ছেলে-ভুলনো ছড়ার ভাষ্য অনুযায়ী কত 'ব্ল্যাকবার্ড' দিয়ে তৈরি হয়েছিল পিঠে ?

(১৯) ইশপের কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটির নীতিশিক্ষাটি কী ?

(২০) 'ফেমাস ফাইভ' সিরিজের গল্পে জর্জিনার পোষা কুকুরটির নাম কী ?

(২১) কে সেই মেয়েটি, যে গিয়েছিল এক আজব বাড়িতে, পরিজ খেয়েছিল, বসেছিল চেয়ারে, আর তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল ?

(২২) বন্ধুদের দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিয়েছিল টম সয়্যার ?

(২৩) গল্পের কোন চরিত্রের প্রিয় বুলি, "ওর গর্দান নাও।"

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক)

(খ)

প্রশ্ন :

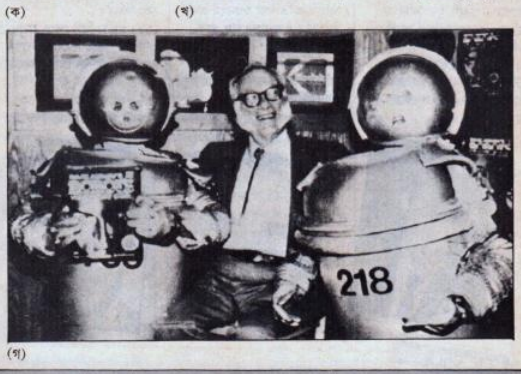

(ক) ১৯৯২ সালে ইনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর নাম কী ?

(খ) বিখ্যাত কবি। এঁর নাম বলো।

(গ) এঁর লেখা কল্পবিজ্ঞান কাহিনীগুলি সর্বাধিক সমাদৃত। প্রায় ৫০০ বই ইনি লিখেছেন। এঁর নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) নরেশ মেটা। (খ) ঈশ্বর গুপ্ত। (গ) আইজ্যাক আসিমভ।

(গ)

এবারের প্রশ্নগুলি সঙ্কলিত হয়েছে '১৫০০ লিটারেচার কুইজ বুক' থেকে।

উত্তর : (১) গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। (২) ভারতবিধাতা। (৩) ছেলেবেলা। (৪) মৃণাল সেন। (৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৬) বাঘেরা আর ভালু। (৭) কাজি নজরুল ইসলাম। (৮) বাণভট্ট। (৯) সত্যজিৎ রায়। (১০) কৌটিল্য। (১১) বিষ্ণুশর্মা। (১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৩) মহাত্মা গান্ধী। (১৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (১৫) ২০ বছর। (১৬) জ্যাক। (১৭) জুপিটার জোন্স। (১৮) ২৪। (১৯) ধীর ও একাগ্র মানুষই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। (২০) টিমথি। (২১) গোল্ডিলক্স। (২২) পাঁচিল রং করা। (২৩) হরতন-এর বিবির।

দেখলে যেন চোখ ফেরে না, চড়লে যেন রোমাঞ্চের সীমা থাকে না।

এক নজরেই মন জয় ক'রে নেবে ভেস্পা সিলেক্ট। আর একবার চালালেই বুঝবেন, এর অনুভূতি এমনই জবরদস্ত যে না নিয়ে থাকতে পারবেন না। ভেস্পা সিলেক্ট চালানোর অসাধারণ অনুভূতির শুরু, এর পুশ বটন স্টার্টে। বটনে আঙুল ছোঁয়াতেই 7.8 হর্সপাওয়ারের (বি এইচ পি) নতুন ইঞ্জিন আপনাকে দেবে অতুলনীয় পিক-আপ–0 থেকে 60 কিঃ মিঃ প্রতি ঘণ্টা গতি স্রেফ 8.7 সেকেণ্ডে যা স্কুটারের মধ্যে সবথেকে বেশী। আর জ্বালানী সাশ্রয়ও সবথেকে বেশী।

নতুন সিলেক্টের সীটে আছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম এ্যাডজাস্টেবল ব্যাক রেস্ট (পেটেন্ট বিবেচনাধীন) আপনার প্রতি সফর আরো আরামদায়ক করার জন্যে। সঙ্গে দেওয়া আছে এক হেলমেট লক্ যা আপনাকে হাতে করে হেলমেট বয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়।

এইসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলেছে ভেস্পাকে আরো উন্নত আরো উত্তম করার নিরন্তর প্রয়াস। সিলেক্টে কিছু জিনিষ আছে যা অটুট, সেখানে কোন হেরফের নয়। যেমন, ভেস্পার সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা। তাই তো, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের ওপর 5 বছরের ওয়ারান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারান্টি। সঙ্গে দেশব্যাপী 600-এরও বেশী সার্ভিস সেন্টারের নেটওয়ার্ক।

ELECTRONIC PARTS 5 YEAR WARRANTY

তবে হ্যাঁ, আমাদের কথা শুনে বা পড়েই সবকিছু বিশ্বাস করতে বলি না। আপনি স্বয়ং আসুন যে-কোন ডীলারের কাছে। তারপর নিজেই চালিয়ে দেখুন, পরখ করুন নতুন ভেস্পা সিলেক্ট। তাহ'লেই বুঝবেন এর ফারাকটা কোথায়।

আকর্ষণীয় মেটালিক রঙে পাওয়া যায়–মিডনাইট ব্লাক, এমারেল্ড গ্রীন, মালবেরী রেড আর এক্টিল ব্লু।

vespa Select

সফরের অনবদ্য আনন্দ, এখন যেন তুলনাহীন।

ULKA 20324 BEN R

ANANDAMELA 27 APRIL 1994 REGD. NO
WB/CC/264 MB BY SOUTH-683 TN/MS(C) 751

গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ আর নয়

জামাকাপড়ে আনুন উজালা'র চোখধাঁধানো শুভ্রতা

গৃহিনীদের জন্যে সুখবর ! বহু বছরের অক্লান্ত গবেষণার পর জ্যোতি ল্যাবরেটরীজের বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন একটি বিশেষ ফর্মূলার উপাদান । নাম, ভি + (V Plus)। আর সেই ভি + 'এরই বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে তাঁরা তৈরী করেছেন যুগান্তকারী এক তরল ফেব্রিক হোয়াইটেনার – উজালা সুপ্রীম *।

ভি + (V Plus) কী ? সাধারণ গুঁড়ো নীল জলে ঠিকভাবে মেশেনা, তাই তলানি পড়ে। পরিষ্কার ধোওয়া জামাকাপড়ে সেই তলানি ছেড়ে যায় বিচ্ছিরি দাগ । অনায়াসে ভি + ফর্মূলার উজালা নিমেষেই সমানভাবে জলে গুলে যায় এবং কাপড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গিয়ে আনে শুভ্রতার জোয়ার।

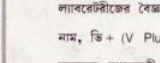

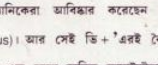

এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটা উজালা মেশান । এবার সদ্য ধোওয়া জামাকাপড় তাতে ডুবিয়ে আলতো হাতে নিংড়ে নিন । তারপর দেখুন জামাকাপড় কেমন চোখের নিমেষেই হয়ে উঠেছে চোখধাঁধানো সাদা। এবং কত সহজেই !

এরপরও কী সাধারণ ডেলা পাকানো গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ ভালো লাগবে আপনার ?

UJALA
Supreme
From Jyothy Laboratories

* ভি + সমৃদ্ধ উজালা সূতীর কাপড় ছাড়াও ব্লেণ্ডেড কাপড়, উলের এবং সিন্থেটিক কাপড়েও নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

Situations/ JL/01/94